KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication 28, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title সমকালীন (SAMAKALIN)	Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number ৩/- ৩/- ৩/- ৩/-	Year of Publication : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২ শ্রাবণ, ১৩৬২ ভাদ্র, ১৩৬২ কার্তিক, ১৩৬২
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নারায়ণ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি এ্যাষ্ট্রোলজিক্যাল রিসার্চ
কার্যালয়ে পাওয়া যাইতেছে।

৮, আশুতোষ শীল লেন, কলিকাতা-৯

বই-এর নাম — লেখক

১। রাশি ও লগ্ন বিজ্ঞান রহস্য—পণ্ডিত রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী
২। হাতের রেখায় জীবন রহস্য—ডঃ গৌরাঙ্গপ্রসাদ শাস্ত্রী (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রতি খণ্ড
৩। Expression & Language of the Unconscious—Sri Sabyasaci
৪। নতুন দৃষ্টিকোণে গ্রহ নক্ষত্র ও সাব—শ্রীসব্যসাচী
৫। নাড়ী জ্যোতিষ ও ফলিত জ্যোতিষ রহস্য—শ্রীবিষ্ণুদাস জ্যোতিঃশাস্ত্রী
৬। জ্যোতিষী শিক্ষা—শ্রীবিশ্বনাথ দেবশর্মা (১ম,২য়,৩য়,৪র্থ,৫ম খণ্ড) প্রতি খণ্ড ১০·০০
৭। Jyotish Sanchayan
৮। Questions in Jyotisnatak Examination (1975-85) and Hints
Answer—Viswanath Deva Sarma
৯। বিজ্ঞানের আলোয় জ্যোতিষ—শ্রীউৎপল চক্রবর্তী
১০। Table of Ascendants & Ephemeris—By N. C. Lahiri
১১। লঘুজাতকম্- অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য
১২। বৃহৎজাতকম্—ডঃ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী
১৩। জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ—১ম ও ২য়, প্রতি খণ্ড
ঐ ৩য় খণ্ড
১৪। গ্রহের দ্বাদশ ভাবস্থিতি ফল ডাঃ রণতোষ সাহা
১৫। ফলদীপিকা—ডঃ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী
১৬। ভারতীয় সাহিত্যে জ্যোতিষ প্রসঙ্গ—ডঃ গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়
১৭। জ্যোতিষতত্ত্ব সংকেত ও বিশ্লেষণ—শ্রীমলয় রায়
১৮। মিথ্যা নয়, সত্য—প্রীতি রায়
১৯। গ্রহের ভাবপতির দ্বাদশ ভাবস্থিতি ফল—ডাঃ রণতোষ সাহা

ভি পি তে পুস্তক পাঠানো হয়ে থাকে। ডাক ব্যয় বাবদ ১০.০০ ও পুস্তকের অর্ধ মূল্য অ

সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সম্পাদক

ম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর — নারায়ণ চৌধুরী

তীয় বর্ষ — পৌষ — ১৩৬২

PRECISION & PERFECTION
IS OUR WATCHWORD.

DEY'S MEDICAL STORES LTD.
CHEMISTS & DRUGGISTS
(Retail Department)

6-2B, LINDSAY STREET,
CALCUTTA 16
Phone : 23-3664. (3 Lines)

PRESCRIPTIONS ARE SERVED WITH SCRUPULOUS CARE
BY EXPERIENCED PHARMACEUTICAL GRADUATES

সমকালীন

॥ সূচীপত্র ॥

তৃতীয় বর্ষ পৌষ ১৩৬২

প্রবন্ধ

অবনীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী : সোমেন বসু ৯
ভরতনাট্যম্ : শ্রীমতী ঠাকুর ২৫
বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' : রথীন্দ্রনাথ রায় ২৮

কবিতা

এ জীবনে তুমি আছ : রণজিৎকুমার সেন ১৮
দূরময়ী : সুশীলকুমার গুপ্ত ১৯
প্রত্যয় : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ২০
প্রস্ফুটিত : সুশান্ত ঘোষ ২১
মাঠে মাঠে মাঝরাত : সুনীল বসু ২২
একটি কবিতা : চার্লস বোদলেয়র ২৩

গল্প

ময়লা মলাট : ধীরেন বসু ৩৩

উপন্যাস

পুরন্দরণ : মদন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪১

আলোচনা

দেবতা : ত্রিলোচন সরকার ৫০

গ্রন্থপরিচয়

সঙ্গীত-পরিক্রমা (নারায়ণ চৌধুরী) : অরুণ ভট্টাচার্য ৫২

পরিচালক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ২৮, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

ARUNA MILLS
MARINA
more DURABLE
more STYLISH
Specialities
SAREES
DHOTIES
SHIRTINGS
POPLINS
LONG CLOTH
VOILS Etc.
in Exquisite Patterns
ARUNA
MILLS LTD.
AHMEDABAD
★ ARUNA ★
★ ARUNA ★

সমকালীন
তৃতীয় বর্ষ, পৌষ, ১৩৬২

অবনীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী

সোমেন বসু

জীবনস্মৃতির শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে কোন এক অজানা চিত্রকর স্মৃতির পটে ছবি এঁকে রেখে গেছে—কেন যে এঁকেছে, তাও সেই চিত্রকরের মতই অজানা। অনেক দূরে দাঁড়িয়ে জীবনের ঘটে-যাওয়া অতি-বাস্তব ঘটনাগুলো যেন চমৎকার ছবির মতো ভেসে ওঠে—পথিক যে পান্থশালায় থাকে সে পান্থশালা ছবি নয়, কিন্তু "যখন পথিক তাহা পার হইয়া আসিয়াছে, তখনই তাহা ছবি হইয়া দেখা যায়।"

আত্মজীবনী রচনার প্রেরণা মানুষের জীবনে নানাভাবে আসে। বন্ধুজনের উপরোধ, আত্মপ্রকাশের সুগভীর বাসনা, কোন জীবনে পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক চিত্ররচনা, আপন উপলব্ধির ইতিহাস ব্যক্ত করা—সবই জীবনচরিত রচনায় প্রেরণা যোগাতে পারে। নিজেকে ব্যক্ত করার যে গোপন তাড়না, তা প্রত্যেক মানুষের জীবনেই কোন না কোন দিন ধাক্কা দিয়েছে। শিল্পীর শিল্পসাধনাও এই আত্মপ্রকাশের বাসনার পথ ধরেই আসে। শিল্পীমনের যে পরিচয় শিল্পবস্তুর মধ্যে রয়েছে শিল্পী তাকেই নিজের জীবন বলে দাবী করেন। শিল্পবিকাশেই তাঁর জীবনের বিকাশ। রবীন্দ্রনাথ তাই আত্মপরিচয় ঘোষণা করতে গিয়ে তাঁর ভাবপরিণতির ইতিহাস দিয়েছেন—ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের সুখদুঃখকে ছাপিয়ে কবি-রবীন্দ্রনাথের আত্মউপলব্ধির ইতিহাসই তাঁর আত্মপরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মজীবনী শুধু তাঁর আত্মজীবনই নয়, তা' তৎকালীন ব্রাহ্ম আন্দোলনের ইতিহাসও বটে। লেখক নিজেকে ব্যক্ত করেই খুশী নন, তাঁকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন আবর্তিত হয়েছে, তার গতি ও আবর্তনের একটি সুচারু চিত্রও পাঠকের সঙ্গ দিয়েছেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিলো। তিনি তাঁর চোখ দিয়ে সমাজকে নূতন দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, নবীন ও

পুরাতনের যে সংঘাত তখন জাতীয়-জীবনের সর্বক্ষেত্রে চলেছে, তার ইতিহাস তিনি নিজেকে কেন্দ্র করে দিয়ে গেছেন। ব্যক্তিকে তার কর্মজীবনের সূত্রে গ্রথিত করে লেখক নিজের এবং সমাজের অগ্রগতি ও পরিণতি একাত্ম করে দেখেছেন।

আত্মজীবনীর যত রকম শ্রেণীভেদ করা যায় তার কোনটাতেই ফেলা যায় না অবনীন্দ্রনাথের 'আপন কথা'কে। 'আপন কথা' একাই একটি শ্রেণী, ইংরাজীতে বলা চলে class in itself। নিজের অতীতস্মৃতিকে কেন্দ্র করে অবনীন্দ্রনাথ যে রহস্যের মায়াজাল বিস্তার করেছেন তা কোন চলতি মানদণ্ডের বিচারের অপেক্ষা রাখে না। একে রূপকথা বললে আপত্তি নেই, পটে আঁকা ছবি বললেও না বলতে পারবো না। মাঝে মাঝে মনে হয় এ রচনা সম্পর্কে যে কোন বিশেষণই দিই না কেন, সব কথা বুঝি বলা হলো না।

আমাদের মনের চেতন লোকে যত জিনিষ জড়ো হয় তারই হিসাব-নিকাশ নিয়ে আমরা সৃষ্টি করতে বসি। চেতনা দিয়ে অনুভব করি সংসারকে, স্থির করি সিদ্ধান্ত, বিচার করি ভালমন্দ, প্রকাশ করি মন্তব্য। মনের অবচেতনে কত জিনিষই থেকে যায় ঘুমিয়ে, কত জিনিষ চেতনার স্পর্শমণির ছোঁওয়ার প্রতীক্ষাতেই থেকে গেল, তার হিসেব কেই বা রাখে। জীবনের প্রত্যন্তদেশে পৌছে, জগতের স্মরণীয়তম ঘটনাগুলিকে মানুষ তার মনের ভাবনা দিয়ে ব্যাকুলতা দিয়ে লিখতে চায়, তার অন্তরের কোন গোপনতন্ত্রী সেই ঘটনার আঘাতে আঘাতে চঞ্চল হয়েছে তা' প্রকাশ করতে তার আকুলতার অন্ত নেই। তাই তার চেতন মনের উপর যত তরঙ্গ উঠেছে মানুষ সেই তরঙ্গ ভঙ্গের ইতিহাস রেখে যেতে যায়। কিন্তু সমস্ত জীবন খুঁজে খুঁজে সুদীর্ঘকালের ব্যবধান পেরিয়ে কোন অস্পষ্ট ছায়ালোক থেকে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর চেতনার প্রথম স্ফুলিঙ্গগুলিকে উদ্ধার করে এনেছেন। এগুলো বস্তুজগতের হিসাব-নিকাশে অবশ্যই বহুমূল্য নয়, কিন্তু শিল্পীর চেতনায় বহির্বিশ্বের তারাই হলো প্রথম আলোকপাত। তার আগে যা কিছু, তা নিকষকালো অচেতনার অন্তরালে ঢাকা পড়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে তাঁর প্রথম পাঠের বিবরণ দিয়ে বলেছেন—"কেবল মনে পড়ে 'জল পড়ে পাতা নড়ে'···আমার জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা···ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।" প্রথম চেতনার ঐ যে জাগরণ, শিল্পী বা স্রষ্টারা তাকে আর দশটা ঘটনার মতো একটি মনে করেনা। যে মন এত সুদীর্ঘ পথ চলে চলে, এতটা কাল কাটিয়ে দিল, কবে কোন সুদূরে তার যাত্রা হয়েছিল সুরু? এ প্রশ্ন আর কারুর মনে থাক্ বা না থাক্ স্রষ্টার মনে থাকবে। তাই অন্য সব ঘটনার জঞ্জাল পেরিয়ে সেই শিশুকাল থেকে ভেসে এলো কয়েকটি অতি সাধারণ ঘটনা যারা এমন করে অসাধারণকে দেখবার দৃষ্টি খুলে দিল শিল্পীর।

অবনীন্দ্রনাথ হচ্ছেন বাংলা শিশুসাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট। তাই যারা শিশু, যাদের চেতনায় সদ্যসূর্যালোকের স্পর্শ লেগেছে তাদেরই জন্য তাঁর লেখা। সেইজন্যেই জ্ঞানবৃদ্ধ সমালোচনার ভয়ে পদে পদে তাঁকে নজর রাখতে হয়না, তাঁর গল্প ইঁট-কাঠের বাস্তবের সঙ্গে মিলেছে কিনা! তাঁর শ্রোতাদের মত তিনি নিজেও। রূপকথার শ্রোতারাই যে কেবল রস উপলব্ধি করে তা' নয়,

বক্তা নিজেও নিজের সেই ছোট টুকরো টুকরো ছবিগুলি দেখতে দেখতে ভাবমুগ্ধ হয়ে গেছেন। মন চলে গেছে কোন্ সুদূর লোকে, শিল্পী হয়ে উঠেছেন কবি, সামনে বসেছে ছেলের দল, চলেছে অবনীন্দ্রনাথের গল্প। পাঠকগোষ্ঠীকে চোখের সামনে রেখে তাদের মনের মত করে কথা বলে লেখক, যখন তার কাজ কোন বিশেষ কিছু প্রচার বা ঘোষণা। কিন্তু যে পাঠকগোষ্ঠী বা শ্রোতার দল অবনীন্দ্রনাথের সামনে বসেছে এদের মনে যেহেতু মতলবের বীজ বপন হয়নি এখনও তাই তাদের মনের মত লেখাতেই তাঁর সৃষ্টির সার্থকতা। তাই তিনি বলেছেন—"যারা কেবল শুনতে চায় আপন কথা, থেকে থেকে যারা কাছে এসে বলে 'গল্প বলো,' সেই শিশু জগতের সত্যিকার রাজারাণী বাদশা-বেগম তাদেরই জন্য আমার লেখা এই পাতা ক'খানা।···আর ডান হাতের কুর্নিশ রইলো তাদেরই জন্যে যারা বসে শোনে গল্প রাজ-বাদশার মতো, কিন্তু ছেঁড়া মাদুরে নয়তো মাটিতে বসে; আর গল্পের মাঝে মাঝে থেকে থেকে যারা বকশিশ দিয়ে চলে একটু হাসি কিম্বা একটু কান্না; মানপত্রও নয়, সোনার পদকও নয়; হয় একটুখানি দীর্ঘশ্বাস, নয় একটুখানি ঘুমে ঢোলা চোখের চাহনি।" মন যাদের পদে পদে বাস্তব অবাস্তবের সীমারেখা টেনে আঘাত খেয়ে খেয়ে মরে তাদের জন্য এ জীবন-কথা নয়, এ জীবনকথা তাদের জন্য যারা এসে বলে 'গল্প বলো'। কিন্তু যারা ছাপাব এই বই, যারা পড়বে বয়স্কলোক, তাদের জন্য কি রইলো?—"যারা কিনে নিতে চায় পয়সা দিয়ে আমার জীবনভরা সুখ-দুঃখের কাহিনী, এবং সেটা ছাপিয়ে নিজেরাও কিছু সংস্থান করে নিতে চায় তাদের আমি দূর থেকে নমস্কার দিচ্ছি।······ছাপা হবে হয়তো বইখানা। একদিন কোন বেরসিক অল্প দামে কিনে নেবে আমার সারা জীবন খুঁজে খুঁজে পাওয়া যা কিছু সংগ্রহ। এইটে মনে পড়ে যখন তখন হাসি পায়। বলি একি হয় কখনো? সব কথা কেউ কি জানতে পারে না জানাতেই পারে কোনকালে?" "······অনেক ভুগে পাওয়া এ-সব কাহিনী, কিনতে গেলে ঠকতে হয়, বেচতে গেলে ঠকতে হয়।"

সংসারে কি সুন্দর আর কি সুন্দর নয় সেটা বোঝাবার কোন বাঁধাধরা মানদণ্ড নেই। সব মানুষের কাছে একই জিনিষ ভাল লাগবে এ' কখনো হয়না। কারণ মনের কোন নির্দিষ্ট চেহারা নেই যে, যে কোন মতবাদের জামা পরালেই তাকে বেশ মানাবে। প্রাচীনকালের রাজারা তাঁদের হুকুমের গুঁতোয় শিল্পীর তুলি আর লেখনীকে চালিয়েছেন বহুবার, তাতে লেখার চারুত্ব প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু বক্তব্যে প্রাণের সুর লাগেনি। ষ্ট্যালিন-শাসিত রাশিয়ায় ঠিক তেমনি করেই রাষ্ট্র ছাপ মেরে দিয়েছে কোনটা তাদের মধ্যে সৎসাহিত্য আর কোনটা নয়; মানুষের প্রকাশশীল মনের উপর এমনি করে গদা ঘুরিয়ে সুন্দর-অসুন্দরের যে মান স্থির হয়েছে তা কোন সৃষ্টিশীল লোকের কাছেই গ্রাহ্য নয়। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচনায় বলেছেন যে সংসারে যার রূপ দেখার চোখ নেই তার চোখে যতই জ্ঞানাঞ্জনশলাকা ঘসে দেওয়া হোক্ দৃষ্টি তার কোনদিনই খুলবেনা যদি অন্তরে বোধ না জাগে। সংসারে লোকের চোখে ময়ূর সুন্দর কিন্তু কলবিঙ্ক নয়, কাক নয়—এই কথা বলবার লোকেই বেশী। যার চোখে আপনা থেকেই কলবিঙ্কের রূপ ধরা পড়েনি তাকে তো হাজার বক্তৃতা দিয়েও বোঝানো যাবেনা কলবিঙ্কের রূপ কোথায়! তাই দেখি আমাদের জীবনে যা অতি সাধারণ, তাই শিল্পীর চোখে অসাধারণ—

আমাদের জীবনে ঝড়ের অভাব নেই—মনের স্মৃতিপটে অল্পবয়সে দেখা দু'একটি ঝড়ের গর্জ্জনের ছবি যে একটুও নেই তা' নয়, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের জীবনেও সেই ঝড় এলো, এলো তাঁর চেতনাকে জাগাতে। যে ছেলে তিনতলা থেকে নামেনি, ঝড়ে তাকে নামালো দোতলায়—নতুন এক জগতের সিংহদ্বার খুলে দিলে চোখের সামনে। আর সব মুছে গেল কিন্তু পক্ককেশ অবনীন্দ্রনাথের মনে অতিসুদূরের স্মৃতিমঞ্জুষা থেকে ভেসে এলো ঐ নিয়মভাঙ্গা ঝড় যা তাঁকে নামিয়েছিল তেতলা থেকে দোতলায়। রূপকথার একটা ধর্ম হচ্ছে যে শিশুকে সে একথা ভুলিয়ে দেয় যে সে শিশু। শিশু তখন সেই রূপকার রাজ্যের রাজপুত্র হয়ে দাঁড়ায়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলছেন যে শিশু রূপকথা ভালবাসে কারণ "The child……doth reap

One precious gain, that he forgets himself."

কিন্তু রূপকথার সত্যকার স্রষ্টাও সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ভুলে বসেন। শুধু শিশুকে ভোলানো নয়, তিনি নিজেকেও ভোলান। অবনীন্দ্রনাথের অতি বাল্যবয়সেও চমকপ্রদ স্মরণীয় ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটেছে ঠাকুরবাড়ীতে কিন্তু চেতনমনের সেই স্মৃতিগুলিকে শিল্পী যে ইচ্ছে করেই ভুলেছেন। বেছে বেছে এনেছেন সেই ঘটনাগুলি যার পুরস্কার ঘুমে ঢোলা চোখের চাউনী।

রূপকথার স্রষ্টা কিন্তু সচেতনভাবেই জানতেন এই রূপকথা তাঁর শ্রোতাদের মনে কী রঙের ছাপ লাগিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের 'রাজার বাড়ী' কবিতায় ছোট ছেলেটি তার মার কাছে বলছে ছাদের পাশে যে তুলসীগাছের টব তারই পাশে রাজবাড়ী, তারই পাশে ঘুমন্ত রাজকন্যা তারই পাশে নাপ্‌তে-পাড়া। বাস্তব জগতের প্রতি কী গভীর অবজ্ঞা। রাজবাড়ী, রাজকন্যা, নাপতে-পাড়া সবই পাশাপাশি। সমাজ তার ভ্রুকুটিকুটিল রীতিবদ্ধতা নিয়ে পালাবার পথ খোঁজে। অবনীন্দ্রনাথের শিশুচিত্তের উপরেও একদিন ঐ রূপকথার প্রভাব পড়েছিল বোধহয়। সেই প্রভাবেই শিল্পীর মনে জন্ম হলো, 'রাজকাহিনী', 'বুড়োআংলা', 'ভূতপতরীর দেশ' আর 'আপন কথা'র। তাই গরাদে আঁটা ছোটছোট জানলা দিয়ে চোখে পড়লো "মানুষ, মুরগী, হাঁস, গাড়িঘোড়া, সহিস, কোচম্যান, ছিরু মেথর, নন্দ ফরাশ,, গোবিন্দ খোঁড়া, বুড়ো জমাদর, ভিস্তি, মুটে, উড়ে বেহারা, গোমস্তা, মুহুরি, চৌকিদার, ডাক-পেয়াদা সবাইকে নিয়ে মস্ত একটা যাত্রা চলছে এই উত্তরের আঙ্গিনাটায়।" বাস্তবে যারা অকিঞ্চিৎকর তারাই শিশুমনের রাজদরবার আলো করে বসেছে। রূপকথায় যে শুধু রাজপুত্র এসেছে তা' নয় প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্রকে ঘিরে নিজেদের অজান্তে যারা রাজা-উজীর-আমীর-ওমরাহ হয়ে বসেছে তারা ওই মুরগী, হাঁস, নন্দ ফরাশ, গোবিন্দ খোঁড়া আর উড়ে বেহারার দল। তাই বলছি শুধু শ্রোতা নয় স্রষ্টার মনেও নতুন জগৎ তৈরী হয়েছে যাতে সুদীর্ঘকাল পরে আর সব স্মৃতির মধ্যে ঐ চরিত্রগুলিই বড় হয়ে আছে।

নিজের রূপকথা শোনার প্রসঙ্গে বলছেন "সেই ঘরের এককোণে বসে রূপকথা বলে একটা দাসী--দাসীটার চেয়ে তার রূপকথাটাকে বেশী মনে পড়ে। এই দাসীটা ছিল আমার ছোটবোনের। সে বলে তার দাসীর নাম ছিল মঞ্জরী।···আমি দেখি মঞ্জরীকে—বসে আছে

একটা লাল চামড়ার তোরঙ্গ ঠেস দিয়ে দুই পা ছড়িয়ে।. তোরঙ্গটার সকল গায়ে পিতলের পেরেক মালার মতো করে আঁটা। মঞ্জরী ঝিমচ্ছে আর বলছে, "এক ছিলো টুনটুনি—সে নিমগাছে বাসা না বেঁধে রাজবাড়ীর ছাতের আলসেতে থাকে আর রাজপুত্তুরের তোশক থেকে তুলো চুরি করে করে ছোট্ট একটি বাসা বাঁধে!" গল্পটা ঐটুকুই। ঐতেই শিশুচিত্ত আপন বিস্তারের পথ খুঁজে পেল। সেই গল্পটি আরও সুন্দর—"ছাতে ওঠবার সিঁড়ি বলে একটা কিছু নেই তখনো আমার কাছে, অথচ টুনটুনির বাসার কাছটায়—একেবারে নীল আকাশের গায়ে, ছাতে কার্ণিসে উঠে গিয়ে বসি পা ঝুলিয়ে। এমনি দিনের বেলায় রূপকথার সিঁড়ি ধরে পাখির সঙ্গে পেতেম ছাতের উপরের দিকটা।······এমনি করে গল্প কথার মধ্য দিয়ে কতো কি দেখেছি তখন। যখন চোখও চলে না বেশিদূর, পা ও হাঁটেনা অনেকখানি, তখন কান ছিল সহায়। সে এনে পৌঁছে দিত কাছে ছাত, হাতে এনে দিত কমলাফুলির টিয়ে পাখি, চড়িয়ে দিত আগডুম বাগডুম ঘোড়ায়, লাটসাহেবের পালকিতে এবং নিয়ে যেতো মাসীপিসির বনের ধারের ঘরটাতে আর মামার বাড়ির দুয়োরেও।"

কিন্তু এতো শুধু খেয়ালী অবনীন্দ্রনাথের রূপকথার আসর জমানো গল্প নয়। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি এর ভিতর দিয়ে যেন রূপস্রষ্টা অবনীন্দ্রনাথ কথা বলছেন; বলছেন কেমন করে তাঁর মনে ঐ আপনভোলা রূপকথার জগৎ মাঝে মাঝে হাতছানি দিয়ে যেতো ভুলিয়ে দিতো সংসারের দেনা-পাওনার হিসাব-বেহিসাবের গরমিল। নিজের অজান্তেই বোধহয় আত্মবিস্মৃত শিল্পী তাঁর ভিতরের রূপমহলের, রঙে রসে বিচিত্র চিত্রশালার কারখানার চাবিটি আমাদের হাতে দিয়ে গেলেন।

তাই দেখতে পাই আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন কেমন করে এই আপন-কথার ছবিগুলি হঠাৎ তাঁর মনের দুয়ারে এসে আত্মপ্রকাশ দাবী করে বসে। জীবনের কোন ঘটনাই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে মনে পড়ছেনা। পরপর বলে যাবেন বাছবিচার না করে তা' তো শিল্পীর মনে হবার নয়। জীবনে যত ঘটনা ঘটে সব তো স্রষ্টার কাছে একমূল্যের দাবী নিয়ে আসেনা। স্রষ্টার অন্তরে আর একটা পৃথিবী আছে, যেখানে বাইরের জগৎ শুধু ছায়া ফেলে না, নতুন করে জন্মও নেয়। স্রষ্টার কাছে, শিল্পীর কাছে সেই অন্তর্লোকের জগৎ বাইরের জগতের চেয়ে অনেক বেশী সত্য। সেইজন্যেই বাইরের জগৎকে স্রষ্টা নির্বিচারে গ্রহণ করেনি, কখনও করেনা। সংসারের ঘটনার জঞ্জাল সরিয়ে কখন যে কবি, শিল্পী হঠাৎ তার মনের জিনিষটি খুঁজে পান তার হিসেব কেউ জানেনা—অথচ মানুষের সকল সৃষ্টির সকল রহস্য সেই মনের মত জিনিষ খুঁজে পাওয়াতেই গোপন হয়ে আছে। পথে যেতে যেতে দুধারে কবি দেখেছিলেন রক্তকরবী ফুটে আছে থরে থরে—সৃষ্টির কারখানায় ভিতরে ভিতরে কাজ সুরু হয়ে গেল। কিন্তু যতদিন না কবি নিজে রক্তকরবীর ভূমিকায় লিখলেন যে এত বড় সৃষ্টির মূলে ঐ কটা আলোকদীপ্ত রক্তকরবীর প্রেরণা কাজ করেছে ততদিন এর সমস্ত রহস্যটি নিছক তত্ত্বব্যাখ্যাতেই ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ এই কথাটিকে নিজের মত

করে বলেছেন—এ যেন সেই emotion recollected in tranquility—হঠাৎ মনের দরজায় এসে আঘাত করছে, আমি এসেছি চটপট কলম নাও তুলি নাও, লিখে ফেলো। তাঁর অনবদ্য ভাষাতে যদি পড়ি তাহলে ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন হয়ে যাবে—"সেই ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত না-জানা থেকে জানার সীমাতে পৌঁছনোর বেলা একটা কোন নির্দিষ্ট ধারা ধরে অঙ্কের যোগবিয়োগ ভাগগুলটার মতো এসে গেল জগৎ সংসারের যা কিছু তা তো গুলোনা আমার বেলায়। কিম্বা ঘটা করে আগে থাকতে জানান দিয়ে ঘটলো ঘটনা সমস্ত তাও নয়। হঠাৎ এসে বললে তারা বিস্ময়ের পর বিস্ময় জাগিয়ে—'আমি এসে গেছি।' ঠিক যেমন ছবি এসে বলে আজও হঠাৎ—'আমি এসে গেলাম, একে নাও চটপট।' যেমন লেখা বলে হয়ে গেছি তৈরী, চালিয়ে চলো কলম।"—এইভাবে চটপট মনের কারখানায় নতুন রূপ নিতে বাছা বাছা জিনিষগুলো যিনি পাঠাচ্ছেন তিনি অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় 'চমকি দেবী'। তিনি "হঠাৎ পড়া হঠাৎ না-পড়া দিয়ে" তাঁর শিক্ষা সুরু করে দিলেন। সেই 'চমকি দেবী' চকমকি ঠুকে যে জিনিষগুলো পাঠালেন সেই কবেকার ফেলে আসা ছেলেবেলার রুদ্ধদ্বার ভাণ্ডার থেকে সেইগুলো নিয়েই আপন কথার মালা গাঁথা হয়েছে।

'আপন কথা'র অধ্যায়গুলি পরপর ভাগ করা হয়েছে নানা নামে—মনের কথা, পদ্মদাসী, সাইক্লোন, উত্তরের ঘর, এ-আমল সে-আমল, এ-বাড়ি ও-বাড়ি, অসমাপিকা, বসতবাড়ী—এই কটিতে।

পড়তে পড়তে মনে হয়েছে এর সমালোচনা লেখার ক্ষমতা বুঝি কারুরই নেই। এ যে সমালোচনার অবকাশ দেয় না পাঠককে। যতবারই একটা বিশেষ অধ্যায় পড়ে সমালোচনা করতে বসবো ভাবি ততবারই দেখি নিজের অজান্তে কখন সে অধ্যায় শেষ করে আরও দু'তিনটে অধ্যায় পার হয়ে চলে গেছি। কিছুতেই যেন পড়া ছেড়ে আর আলোচনায় বসা যায় না। মনে হয় কী আলোচনাই বা হবে। এ হলো এমন লোকের কথা যার চোখে অফুরন্ত রঙের স্রোত ধরা পড়েছে, যার কাছে সংসারের তুচ্ছতম শব্দগুলিও পূর্ণপ্রাণ ছবি ফুটিয়ে তোলে, যে পাঠকের কল্পনাকে অবাধ মুক্তি দেয়।

এ-বাড়ি ও-বাড়ি অধ্যায়ে দেখি শব্দ শুনেও ছবি গড়ে তুলতেন কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ। ভোর যখন চারটে, ঘুম যখন সবে ভাঙ্গলো, কিন্তু তখনো ফোটেনি আলো পূর্বদিগন্তে, শিশু অবনীন্দ্রনাথ শুয়ে শুয়ে শুনতে পাচ্ছেন, ঘোড়ার গা ডলছে সহিস, নানা রকম শব্দ সৃষ্টি হয়ে চলেছে, মনে মনে সেই শব্দগুলোকে নানা রকম কথায় তর্জমা করে নেওয়া হচ্ছে, পরিষ্কার একটা ছবি— সহিস ডলছে ঘোড়া, ভেসে উঠছে মনের পটে। "কতকগুলো শব্দ দিয়ে ঘটনাটা দেখতে পাচ্ছি। অন্ধ ভিখারী পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে গান গেয়ে, চোখের আড়ালে সে, কিন্তু তার গানটা ধরে আসতো সে একেবারে তিনতলায় উঠে। সন্ধ্যে বেলায় খিড়কীর দুয়ারে হাঁকতো 'সুশকিল আসান'—কথাটার ঠিক উল্টো অর্থটাই ধরতেন, দুপুর বেলা 'চুড়ি চাই, খেলনা চাই'। এমনি করে আরও কত শব্দ আসতো বরফওয়ালার, ফুলমালির—শুধু রূপের জগৎ নয়, একটা

শ্রুতির জগতও তৈরী হয়েছিল যার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠতো ছবি। কান আর মন পরস্পরে মিলে ঐ জগৎ তৈরী করতো। এমনি করে চোখ কান খুলে সারা জীবন অবনীন্দ্রনাথ বাইরের জগতকে অন্তরে টেনে নিয়েছেন। যে শিল্পী পরবর্তীকালে ছাত্রদের বলেছেন চোখ বুজে ধ্যান করে নয়, চোখ খুলে প্রাণভরে দেখে আঁকো, তিনি যে নিজের জীবনে রূপরসস্বর সবই টেনে নেবেন নিজের মধ্যে এতো হবেই। সমস্ত আপন-কথায় সেই লোকটিকেই পাওয়া যাবে, মনে যার কোন বাঁধন কাজ করেনি। সমস্ত জীবন যার ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে অরূপের সন্ধানে, রূপের আলোক ধারায় বিকশিত হয়ে, সেই শিল্পীর জীবনকথা এই বই।

কিন্তু একথা মনে করার কোন কারণ নেই, কল্পনার সুরবিন্যাসই এই গ্রন্থের শেষ কথা। নানাভাবে জীবন ধরা দিয়েছে; ধরা দিয়েছে সেকাল, ধরা দিয়েছে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী, কিন্তু সব ধরা দিয়েছে একটা সুদূরকালের ব্যবধানের ঘোমটা পরানো রহস্যের মায়াজালের মধ্য দিয়ে। কিন্তু বাড়ীর লোকদের চেয়ে অনেক বেশী জায়গা জুড়েছে চাকরবাকরেরা, দাসদাসীরা, সহিস কোচম্যানেরা। তাদের নিয়েই ছবি আঁকা, তাদের রূপের মধ্য দিয়েই নিজের বাসাচেতনার অনুভব। এই সব নিম্নতলবাসীরা শিল্পীর পূর্বদিনের কল্পনার সঙ্গী। এদের মধ্যে যত ছবি তিনি ফুটিয়েছেন তার মধ্যে বোধহয় গোবিন্দ খোঁড়া ভিস্তি, সমশের কোচম্যানই অপূর্ব। সব চরিত্রগুলিই সুন্দর, এগুলো যেন অবনীন্দ্রনাথের চিত্রবিদ্যাসের মধ্যেও অতুলনীয়। অন্য কোথাও তো দূরের কথা তাঁর মধ্যেও এদের জুড়ী নেই। চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথ জীবনটাকে আগাগোড়াই ছবির মধ্য দিয়ে এঁকেছেন। সে ছবিতে চমকদারী ভাষার রঙ ফলানোর দরকার হয়নি, সহজ ভাষার সহজ টানে দেখবার গুণই তা' ছবি হয়ে উঠেছে। গোবিন্দ খোঁড়া শুধু রূপকথার নায়কই নয়, সে জীবনের একটি বিশেষ টাইপ—

"গোবিন্দ খোঁড়া রাজেন্দ্র মল্লিকের ওখানে রোজই ভাত খায় আর আমাদের গোল চক্কোরটাতে হাওয়া খেতে আসে। কতোকালের পুরনো আঁকাবাঁকা গাছের ডালের মতো শক্ত তার চেহারা, ঠিক যেন বাইবেল কি আরবী উপন্যাসের একটা ছবির থেকে নেমে এসেছে। গোল বাগানের ফটকের একটা পিলপে ছিল তার পিটের ঠেস। বৈকালে সেখানটাতে কারো বসবার যো ছিলনা। বাদশার মতো গোবিন্দ খোঁড়া তার সিংহাসনে খোঁড়া পা ছড়িয়ে বসে যেতো। পাহারওয়ালা, কাবুলিওয়ালা, জমাদার, সরকার, চাকর, দাসী সবার সঙ্গেই আলাপ চলে খাতিরও সকলের কাছেই যথেষ্ট তার। শহর ঘোরা সে যেন একটা চলতি খবরের কাগজ কিংবা ফলকাতা গেজেট। পাঁচিলের উপর বসে সে খবর বিলোতো। শুনেছি প্রথমবার প্রিন্স আসবার সময় পুলিশ থেকে তেল বিলিয়ে গরিবদের ঘরেও দেওয়ালী দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গোবিন্দর ঘর-দুয়োর কিছুই নেই—সে ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্ট মন্দিরে গোছের মানুষ, এটা পাহারওয়ালারা সবাই জানতো। তারা গোবিন্দকে ধরে বসলো পিদুম জ্বালাতেই হবে—ঘর না থাকে ঘর ভাড়া করেও পিদুম জ্বালানো চাই। গোবিন্দ তখন আমাদের গোলচক্করের দরবারে বসেছে; পুলিশের রহস্যটা বুঝেও যেন সে বোঝেনি এইভাবে পাহারওয়ালাকে শুধুলে,

'সরকার থেকে কতোটা তেল গরীবদের দেওয়ানোর হুকুম হলো?' এক-পলা করে তেল যেমন পুলিশম্যান গোবিন্দকে বলা, অমনি জবাব সঙ্গে সঙ্গে "যাঃ যাঃ তোর বড়োসায়েবকে বলিস, গোবিন্দ এক সের তেল নিজে থেকে খরচ করছে।"

এমনি ছবির প্রদর্শনী বসে গেছে বইটাই পাতায় পাতায়—এমনই জীবন্ত এই ছবিগুলো যে পাঠকের মনেও সঙ্গে সঙ্গে ছবি ভেসে উঠছে, পাঠকের কল্পনার প্রদীপ জলে উঠছে শিল্পীর কল্পনার ছোঁওয়া লেগে। শিল্পী তো সেই, যার ছবি শুধু ছবি হয়ে ঝোলেনা চোখের সামনে, মনের গভীরে কল্পনার দোলনাও দুলিয়ে দিয়ে যায়। অবনীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে আর একটি চরিত্র বাংলা সাহিত্যে চিরকালের মত রয়ে গেল, শুধু রয়েই গেলনা সে আপনার মধ্যে খুঁজে পেলো তার কাজের গৌরব তার জীবনের সর্বজনঘৃণ্যতার অপমানকে তুচ্ছ করে। সে হচ্ছে ছিরু ডোম, যার দুহাতের ঝাঁটায় সমস্ত রাস্তায় ঢেউ খেলানো দু'প্রস্থ রেখায় চমৎকার নক্সা টানা হয়ে যেতো। চিরকাল যে ডোম, ঝাঁট দিয়ে ময়লা সাফ যার কাজ, সে হতো—"রাস্তার আটিষ্ট, ধূলোর আটিষ্ট, ডবল ঝাঁটার আটিষ্ট—তার কাজ দেখে চোখ ভুলে থাকতো কতক্ষণ।" সমস্ত জীবনের যিনি আটিষ্ট, কোন তত্ত্ব যাঁর দৃষ্টিকে ঢেকে রাখেনি তাঁর কাছেই ধরা পড়লো ছিরু ডোম, শুধু ডোম নয় সে আটিষ্ট তার ঝাঁটাগুলোর সঙ্গে গভীর উৎসাহে তুলনা দিয়েছেন নিজের তুলিগুলোর। অন্তরে যে গভীর দরদ ছিল ঐ সব বেহারা, সহিস আর ডোমেদের জন্য সেটা কোথাও বক্তৃতা দিয়ে জাহির করার কথা মনেও হয়না কারণ, সে দরদ ছিল স্বচ্ছ, সহজ এবং সূর্য্যালোকের মত সত্য। তাই তো আবিষ্কার করলেন যে ছিরু ডোমও আটিষ্ট যার ঝাঁটা চালনা দেখে অবাক বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে যায় শিল্পীর চোখ।

সব শেষে যে অধ্যায়টি এলো তা' হলো বসতবাড়ী। দ্বারকানাথ তার বাইরের বাড়ী হিসাবে ৫নং-এর বাড়ীটি তৈরী করেন। সেই বাড়ী অবনীন্দ্রনাথের পিতামহ গিরীন্দ্রনাথের ভাগে পড়ে। একদা এই বাড়ীতে বাংলাদেশের শিল্পসাধনার নূতন যুগের সূত্রপাত করলেন গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ। দেশ বিদেশ থেকে লোক এসেছে নবভারতের শিল্পসাধনার ঐ তীর্থকেন্দ্র ৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের ঐ বাড়ীতে। কি প্রচণ্ড প্রাণের স্রোত একদিন ঐ বাড়ী থেকে প্রবাহিত হয়েছে সারা বাংলার সমাজ জীবনে। ঐ বাড়ীটা ছিল অবনীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয়। কতকালের স্মৃতি নিয়ে দ্বারকানাথ থেকে, গগনেন্দ্র সমরেন্দ্র অবনীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত ঐ বাড়ী যে দাঁড়িয়ে রয়েছে; ওযে কতকালের প্রাণপ্রবাহের সাক্ষী। কিন্তু বাড়ী সম্বন্ধে যে ভয় অবনীন্দ্রনাথ করেছিলেন ভবিষ্যৎকালে তাই ঘটলো। তিনি বলেছিলেন,

"আমি বেঁচে আছি পুরোনোর সঙ্গে নতুন হতে হতে, তেমনি বেঁচে আছে এই তিনতলা বাড়ীটাও আজ যার মধ্যে বাসা নিয়ে বসে আছি আমি। আজ যদি কোন মাড়োয়ারী দোকানদার পয়সার জোরে দখল করে ঐ বাড়িটা, তবে এ বাড়ীর এ-কাল সে-কাল দুই-ই লোপ পেয়ে যাবে নিশ্চয়ই। যে আসবে তার সেকাল নয় শুধু একালটাই নিয়ে সে বসবে এখানে। দক্ষিণের বাগান ফুঁয়ে উড়িয়ে ওখানে বসাবে বাজার, জুতোর দোকান, ঘি-ময়দার আড়ং ও নানা—

যাকে বলে প্রফিটেবল কারখানা, তাই বসিয়ে দেবে এখানে। সেকাল তখন স্মৃতিতেও থাকবে না।"

সেই বাড়ী তিনি বেঁচে থাকতে থাকতেই চলে গেল মাড়োয়ারীর হাতে। যদিও তারপর রবীন্দ্রভারতীর পক্ষ থেকে ঐ বাড়ী কেনা হলো, রবীন্দ্রভারতীর কর্তারা মাড়োয়ারীর চেয়ে কিছু ভাল ব্যবহার করলেন না ঐ বাড়ীর প্রতি। দেখালেন অজুহাত, বাড়ী দুর্বল হয়ে পড়েছিল তাই তাঁকে ভাঙতেই হলো। সে বাড়ী আজ নেই। একটু সামান্য অংশ আছে, তাতে দুর্বলতার কোন চিহ্ন নেই। হতভাগ্য দেশ, হতভাগ্য তার সমাজপতিরা। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনার সাধনকেন্দ্র তাই ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হলো বিনা প্রতিবাদে। স্বাধীনদেশের কথা শুনেছি; শুনেছি শেক্সপীয়রের কুঁড়ে ঘর, গ্যেটের বাড়ী, টলষ্টয়ের নিত্যব্যবহার্য জিনিষ আজও তারা যত্ন করে রেখেছে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের 'বসতবাড়ি' কোন উপায়েই নাকি আর বাঁচিয়ে রাখা গেলনা। ভারতবর্ষের দিকে দিকে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যমণ্ডলীর আজ প্রখ্যাতনাম্নী হয়েছে অনেকেই কিন্তু বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হলোনা। গুরুর সঙ্গে সঙ্গেই গুরুর বাসস্থান ধূলিসাৎ হলো। আর কোন দেশে কী এ সম্ভব হতো। এ কাজের জন্য যাঁরা দায়ী তাঁরা রবীন্দ্রনাথের চিন্তা দেখানে অলেছিল তাকে বেড়া দিয়ে ঘেরার কথা ভাবছেন, এঁদের হাতে রবীন্দ্রনাথের বসতবাটি পড়লে তারও বোধহয় একই দশা হতো।

অবনীন্দ্রনাথ 'বসত-বাটি' পর্য্যায়ে বলছেন যে মানুষের সঙ্গ পেয়েই বাড়ীটা বাঁচে, মানুষ যদি না থাকে তবে বাড়ীটা হয়তো পড়ে থাকবে প্রত্নতাত্ত্বিকদের জন্যেই। কিন্তু দেশে মানুষ না থাকলেও অমানুষের অভাব হয়নি। তাই বাড়ীটা যে প্রত্নতাত্ত্বিকদের জন্য বেঁচে থাকবে সেটাও তাদের প্রাণে সয়নি।

সমস্ত বইটা জুড়ে দেখতে পাই জীবনের প্রতি কি গভীর ভালবাসা। তাই নিজের কথা যেটুকু বলেছেন সে ঐ ভালবাসা জানানোর জন্যই। আজকাল সাহিত্যে ভালবাসা বা দরদ জানাতে হলে উচ্ছ্বাসময়ী বক্তৃতার অবতারণা চাই, ভাল যে বাসি এই কথাটা বেশ বার কয়েক চেঁচিয়ে বলা চাই তবে যেন তৃপ্তি। কিন্তু ভালবাসা যার স্বাভাবিক, অন্তর যাঁর কাণায় কাণায় ভরেছে, যিনি দুচোখ মেলে দেখে গেলেন পৃথিবীকে, মানুষকে দেখলেন নানাভাবে, তাঁর ভালবাসায় যেমন উচ্ছ্বাস আছে তেমনি আছে শিল্পীজনোচিত প্রশান্তি। ভালবাসা তো বাইরের তরঙ্গোচ্ছ্বাস নয় সে গভীর উপলব্ধিও বটে।

সমস্ত বইটা পড়ে মন একটা আশ্চর্য্য বেদনায় ভরে ওঠে। সে বাড়ী নেই, সেই ভালবাসার অমৃতউৎস নেই, নেই সেকালের সেই দিনগুলো। নিছক গল্প বলেছেন, নেহাৎই গল্প বলার ঢং, তবু দুচোখ ভরে জল আসে, সমালোচনার সব রীতি ভেসে যায়, নিজেকে প্রশ্ন করি দুচোখ ভরে কি দেখবো কখনো এমনি করে পৃথিবীকে, সুর কি বাজবে এমনি করে কানে? এমন করে কি কোন দিন জীবনকে ভালবাসতে পারবো?

এ জীবনে তুমি আছ

রণজিৎকুমার সেন

সব শেষে শয্যা পাশে তোমারে এ বুকে পেয়ে ক্লান্তি জুড়াই ;
পুবের জানালা দিয়ে মাঝরাতে নেমে আসে দ্বিতীয়ার চাঁদ
তোমার মুখের পরে ; আর আসে নেমে বুঝি একটি চুমো
এ দু'টি ঠোঁটের ! তারপর জানি না যে কখন ঘুমাই।

তারপর ভোর হয়, সূর্য্য ওঠে, জেগে উঠি ভেঙে অবসাদ,
তুমি গিয়ে রান্নাঘরে উনুনে আগুন দিয়ে বাসি কাজ সারো ;
রাত্রির স্বপ্ন নিয়ে দু'চোখে নামে না আর একটু ঘুমও,
অফিসের বেলা বাড়ে, নাকে মুখে গুঁজে কিছু পথে পা বাড়াই।

তারপর সারাদিন গোলামীর নাগপাশে বন্দী হ'য়ে কাটে,
প্রতিপদে সংশয়, প্রতিপদে ভীরুতার গ্লানি বুকে নিয়ে
সকলের মন রেখে ফিরে আসি দিনগত পাপক্ষয় ক'রে ;
অদূরে গীর্জ্জার ঘড়ি বেজে চলে ঢং ঢং সাতটার ঘরে।

পথে এসে মনে পড়ে সংসারের টুকিটাকি নানা প্রয়োজন,
খোকনের বই-খাতা, খুকুর খেলনা আর চিরুণী তোমার ;
পকেটে পয়সা নেই, তবুও পকেট খুঁজি, যদি কিছু পাই,
তোমারে বোঝানো ভার, কি যাতনা নিয়ে ফিরি সারা অন্তরে !

তবুও তোমার প্রেম ধ্রুবতারা হ'য়ে জ্বলে জীবনে আমার,
তবুও তোমার ক্ষমা একটি চুমোয় বুঝি ধ্রুব হ'য়ে ওঠে ?
তোমারে এ বুকে পেয়ে এ বুকের দীনতারে করি মার্জ্জনা,
এ জীবনে তুমি আছ, তাইতো সকল গ্লানি ফুল হ'য়ে কোটে ॥

দূরময়ী

সুশীলকুমার গুপ্ত

এত কাছে আছ তবু মনে হয়, তুমি যেন দূরে—বহুদূরে ;
যদিও বেঁধেছি আমি, দূরময়ী, তোমাকে এ মুগ্ধ জীবনের
প্রেমের মোহিনী মন্ত্রে সংসারের মুখরিত দীপ্ত অন্তঃপুরে,
তবুও তোমার বুকে দেখি ছায়াছবি ব্যাপ্ত মুক্ত দিগন্তের।
তোমার দেহের দীপ ধরে রাঙা নক্ষত্রের ধ্যানমগ্ন শিখা,
নয়নে কাজল-টানে সমুজ্জ্বল আকাশের মদির নীলিমা,
তোমার যুগল করপদ্মে লেখা জ্যোতিষ্কের রূপের লিপিকা,
কম্পিত অধরপুটে ধরা পড়ে আকাশের সলজ্জ রক্তিমা।

তুমি আছ ব'লে এই ম্লান ঘর, বারান্দা ও ঘোরানো সিঁড়িতে
সুদূরের পদধ্বনি নিশিদিন শোনা যায় উৎকর্ণ জীবনে ;
তোমার কল্যাণী স্পর্শে সংসারের অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ বস্তুটিও
সুদূরের বর্ণে জ্বলে হ'য়ে ওঠে অসামান্য, অতি রমণীয় ;
তোমাকেই ভালবেসে মোহ-প্রেম-বন্ধনের থেকে মুক্ত মনে
একদিন চ'লে যাই, দূরময়ী, তোমারি সে-উৎস খুঁজে নিতে।

প্রত্যয়

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সন্ধ্যা হোলে ঘরে ফিরি। প্রভাতের প্রসন্ন ভৈরবী
দিবসের পরিক্রমা স্বরচিত সমাপ্তির পরে
মনে হ'বে করুণ বেহাগ ; সমুদ্র অনেক দূরে
ব্যর্থতার বালুতটে অবিনম্র প্রেরণা জাহ্নবী।

তবুতো এখনো আছি ; ব্রতচারী নম্র চেতনায়
প্রথাদীপ্ত অভিলাষ নিয়মিত চিহ্ন রেখে যায়,
এখনো বেদনাদীর্ণ সীমায়িত জীবনকে ঘিরে
অনেক দিগন্ত সাধ উদ্ভাসিত মনের মুকুরে।
যেহেতু বাঁচতে হ'বে, এই সূর্য্য, স্বর্ণরোদ, জল
আহ্নিক গতির চক্রে ক্ষীণায়ু মানুষ আজো আছে অবিচল ;
আকাশের ঘরোয়ানা ক্ষতজীর্ণ মৃত্তিকার গায়
নিভৃত পাতালমণি স্বপ্নায়ত আনন্দ পাঠায় ;
আজো যে দেউলদীপে ধরণীর প্রশান্ত দুহাতে,
নিবিড়নীড়ের মায়া শুচিশুভ্র স্নিগ্ধ দ্যোতনাতে
'সত্য' হ'য়ে জ্বলে ; সেই মোর বিকল্প প্রতিমা,
বসন্তের বার্তাবহ শীতান্তের বিচলিত হিমা।

আমাকে বাঁচতে হ'বে অবিচল সূর্য্যের প্রত্যয়ে
কেননা পৃথিবী আছে, তুমি আছ জয়ে পরাজয়ে॥

প্রস্ফুটিত

সুশান্ত ঘোষ

অনেকদিনই তো মৌসুমী ফুল
ফুটলো না ; শুধুই নিভৃতে যদি
ঝরে যায় রোদে ভোরের বকুল
তবুও মনের গাংচিল-ওড়া নদী
জল দেবে গাছে ; জীবনের ভাঙ্গামিড়ে
যত্নে ফোটাবে সুরের নীমিল কলি।

যদিও দুজনে বহু রাত চোখ বুজে
ঘুরেছি রাতের ভীরু নির্জন ভিড়ে,—
দেখেছি কোথায় মাটির গভীরে জল
বয়ে গেছে, আর ভোরের সাতকমল
কান্নাতে ভিজে ফুটিয়েছে দলগুলি।

মাঠে মাঠে মাঝ রাত

সুনীল বসু

হলুদ চাঁদের মিহি কাঁচোছোঁকা আলো-সরবতে
মাঝ রাতে বুঝি পাখি কণ্ঠের ফিকে নহবতে,
পাড়াগাঁর ছোটো, মেঠো ঘরে জ্বলা ক্ষীণ হারিকেনে,
মনে পড়ে যায় ঝিলমিল স্মৃতি হাত পাখা টেনে ?

ঝিঁঝি পোকাদের কোরাস মেশানো ঘোরানো বাতাস
আলুথালু করে যুবতী ফুলের শাড়ির আভাস
আঁকাবাঁকা নীল যশোর রোডের তিনটে রাতের
বোরখা ছোঁয়ানো ছায়া উড়ে যায় মেঘের ছাতের।

দূরে ঐ কার কাঁচঘর থেকে বেহালা কাঁদন
ভেসে এসে ছোঁয়, খালের থোঁপায় সেতুর বাঁধন—
জোনাকী আঙুর টুপটুপ্ গলে জলের চুমোয়
টুং টাং বাজে নদীর গীটার,—ঘাসেরা ঘুমোয়।

কুচি কুচি হাসি হেসে নদী বালি চোখে চমকাক্,
সারা আকাশেই আজকে তারার জমাট মোজাক ;
রেলের পায়ের অভিসার শুনি রেশম আঁধার ;
উছলে জোছনা সব বাঁধ ভাঙে বিরহ-রাধার।

একটি কবিতা

চার্লস বোদলেয়র

ভাগ্য-লাঞ্ছিতা সে। তবু সে মনোহর, খুসিতে সে ভরে দেয় মন।
কাল ও ভালবাসা এঁকেছে তাদের নখর চিহ্ন তার দেহে,
নিষ্ঠুর নিশ্চয়তায় শিখিয়েছে তাকে—
যৌবন ও জীবনের সরসতাকে নিয়ে চলে যার প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি চুম্বন।
সে সত্যই কুরূপা। সে যেন একটি পিঁপড়ে, একটি মাকড়সা।
যদি চাও তো তাকে শবও বলতে পারো।
কিন্তু বোলো, তারি সঙ্গে বোলো—
সে রাণীর মতো প্রভুত্বশালিনী, সে বিষ, সে ইন্দ্রজাল, সে অনুপমা।
তার চলার আলো-ঠিকরনো ছন্দ ভঙ্গ করতে পারে নি কাল,
নষ্ট করতে পারে নি তার নিশ্চল ভঙ্গীর সুষমা।
ভালোবাসা বদল করতে পারে নি তার নিশ্বাসের মধুর গন্ধ।
দক্ষিণ ফ্রান্সের রৌদ্র-উজ্জ্বল সুন্দর কামাতুর সহরগুলির প্রাণের বন্যা
বইছে তার ঘন কেশে।
তার বিপুল কেশভারের একটি গুচ্ছও হরণ করতে পারে নি কাল।
তীক্ষ্ণ দশন দিয়ে তার বক্ষকে বৃথাই দংশন করেছে কাল ও ভালোবাসা,
তার তরঙ্গময় উত্তাল বক্ষের চিরন্তন অ-ধরা মনোহারিত্ব
একটুও ম্লান করতে পারে নি তারা।
কালের ঘর্ষণে সে হয়তো ঈষৎ ম্লান, ক্লান্ত কিন্তু সে আদবেই নয় ;
সব সময়েই সে দুঃসাহসিকতার রসে ভরা।
শ্যাকরা গাড়ী কিম্বা মাল-টানা গাড়ী যে গাড়ীতেই ছেড়ে দাও না কেন
তেজী ঘোড়া চিনতে পারে আনাড়ী-ও।
তেজী ঘোড়ার ছবি মনে আনে এই নারী।
এতো মধুর সে, এতো আবেগ-ভরা।

তেম্‌নি উত্তপ্ত আবেগে ভালোবাসে সে
যেমন করে ভালোবাসে নরনারী হেমন্তের দিনে।
শীতের আসন্নতা জ্বালে নতুন আগুন তার প্রাণে,
তার কোমলতার আত্ম-নিবেদন কখনো ক্লান্ত করে না।

অনুবাদ : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভরতনাট্যম্

শ্রীমতী ঠাকুর

ভরতনাটাম্, কথক, কথাকলি ও মণিপুরী এই চারটী হচ্ছে আমাদের দেশের প্রধান নৃত্যরীতি। এদের মধ্যে যদিও প্রকৃতিগত ও পদ্ধতিগত প্রভেদ আছে তবুও এই নৃত্য-রীতিগুলির মূল হচ্ছে ভরতের নাট্যশাস্ত্র। বহুযুগ থেকে ভারতবর্ষে নৃত্যের যে ধারা বয়ে আসছে এবং নৃত্যের যে সংস্কার ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তারই চরম পরিণতি হলো ভরতমুনির এই বিরাট নাট্য-গ্রন্থটী। ভরতমুনির নামের অক্ষরগুলিও যেন বিশেষ অর্থপূর্ণ। ভ-র-ত—এই তিনটী অক্ষর নৃত্যের প্রধান ধাতু-ভাব-রাগ এবং তাল এই তিনটীরই ব্যঞ্জনা-মূলক। নৃত্যে, গানের কথাগুলি নানা মুদ্রার দ্বারা সূচিত, চোখের ও মুখের ভাবে, অন্তরের আবেগ প্রকাশিত হয় এবং পায়ের গতিতে ছন্দের বৈচিত্র্য ধ্বনিত হয়। ক্লাসিকাল নৃত্যের তিনটী বিভিন্ন দিক্ হচ্ছে নাট্য, নৃত্য এবং নৃত্ত। নাট্যে নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে আরও অভিনেতারা যোগদান করেন এবং রঙ্গমঞ্চের নানাবিধ সামগ্রী এখানে স্বীকার হয়। নৃত্য অন্তরের ভাবকে ছন্দময় অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা প্রকাশ করে ও নৃত্ত রূপদান করে কেবল ছন্দকে।

ভরতের প্রণালী আমাদের দেশে প্রায় লোপ পেয়েছে; তবে কিছু কিছু সংস্কার দক্ষিণ ভারতে সংরক্ষিত হয়েছে—যেমন মালবারের কথাকলিতে, দক্ষিণ কানড়ার যক্ষগণ-নৃত্যে এবং তামিলনাড় ও অন্ধ্রের ভাগবত-মেলায়।

বর্তমান কালে যা ভরতনাট্যম্ বলে প্রচলিত তা মূলতঃ দক্ষিণ ভারতের দেবদাসীদের নৃত্য—"দাসী-আট্টম্" বা "সদর"। কতিপয় কলারসিকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় প্রায় তিরিশ চল্লিশ বছর পূর্বে এই লুপ্তপ্রায় 'সদর' নাচের পুনরুদ্ধার সাধিত হয়। তাঁরাই দাসী-আট্টম্ নাচকে মর্যাদা দেবার জন্য ভরতনাট্যম্ নাম দিয়ে প্রচার করেন। চোলা-নৃপতিদের রাজত্বকালে এই নৃত্যকলার পূর্ণ বিকাশ হয়েছিল। তামিল সাহিত্যে এই নৃত্যকলার বহু উল্লেখ আমরা পাই। (প্রাচীন তামিল গ্রন্থ "মৈলাপদিকারমে নৃত্য-শিল্পী মাধবীকে কি ভাবে নৃত্য-শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তার বিষদ বিবরণ আছে। এই নৃত্য-শিল্পীর দেহ-লালিত্য, তাঁর বেশ-ভূষা ও অলঙ্কার তাঁর প্রসাধন এবং তিনি কি কি নৃত্য করেছিলেন তারও হদিস এই বই থেকে পাওয়া যায়।) পূর্বে নৃত্য-শিক্ষক ছিলেন ব্রাহ্মণেরা; পরবর্তীকালে অব্রাহ্মণ নট্টুয়ান গোষ্ঠির গুরুরা এই নৃত্য শিক্ষা দিতেন। এই অব্রাহ্মণ গোষ্ঠি থেকেই শিবানন্দ-পোন্নায়া এবং ওয়াদিভেলু (Vadivelu) দুই প্রসিদ্ধ নৃত্যাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। এই দুইজন আচার্য্য প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে নাচের দুই উপাদাননৃত্য এবং নৃত্ত নিয়ে দাসী-আট্টমের বর্তমান সংহত রূপ রচনা করেন। এই নৃত্য-গুরু গোষ্ঠি প্রায়

লোপ পেয়ে গেছে। (সম্প্রতি পদ্ম-নলুর নৃত্যাচার্য্য শ্রীমীনাক্ষীসুন্দরম্ পিল্লাই-এর মৃত্যুতে আমরা ভরতনাট্যমের একজন সর্বোত্তম গুরুকে হারিয়েছি।)

প্রধানতঃ নারীর অন্তরের আবেগ ও ভাবকে প্রকাশ করে ভরতনাট্যম্। প্রেমের ভাব-বৈচিত্র্য শৃঙ্গার রসই হচ্ছে এই নৃত্যের প্রধান বিষয়বস্তু। ভরত তাঁর গ্রন্থে যে লাস্যাঙ্গের বর্ণনা করেছেন তারই আভাস পাই আমরা এই নৃত্যে। অনুরাগ, অভিমান, ঈর্ষা, বিরাগ, বিরহ বেদনা, কামনা ইত্যাদি নানা ভাব নিপুণভাবে রূপায়িত হয় ছন্দময় নৃত্যে।

বাঁশী, বীণা, কণ্ঠসংগীত, মৃদঙ্গ ও আধুনিক কালে বেহালা—এইগুলি হল ভরতনাট্যমের সংগত। একটী ক্ষুদ্র যষ্টি দ্বারা তাল নির্দেশ দিয়ে এই নৃত্যের প্রধান পরিচালক নট্টুয়ণ নৃত্য ও গীতের পরিচালনা করেন। ভরতনাট্যমের প্রচলিত বেশ-ভূষা হচ্ছে পাংজামার উপর হাঁটু পর্য্যন্ত উঁচু করে পরা দক্ষিণী সাড়ী, কোমরে কটীবন্ধ ও নাকে নাকছাবী। এই বেশ-রীতি এই নৃত্যের উৎকর্ষের সঙ্গে সমতা রেখে চলতে পারে নি। (যাঁরা এই বেশ-রীতিকে প্রাচীন বলে আঁকড়ে থাকতে চান তাঁদের ভাবা উচিত যে পায়জামা পরার রেয়াজ আমাদের দেশে মুসলমান আমল থেকেই প্রচলিত হয়েছে। তাই ভরতনাট্যের নৃত্যের মত এটা আদপেই প্রাচীনত্বের দাবী করতে পারে না।) বর্তমানে যে ভাবে আঁটসাট করে সাড়ীটী পরা হয়, সামনের দিকে সুন্দর করে কুঁচিয়ে বিস্তার করে ঝুলিয়ে কাপড় পরার এই রীতি বেশ মনোরম।

ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটী নৃত্য-পরিকল্পনা দিয়ে রচিত ভরতনাট্যম্ প্রায় তিন ঘণ্টাকাল অনুষ্ঠিত হয়।

এই নৃত্যাঙ্গগুলির প্রথমটী হচ্ছে **আলারিপু**। এটী একটী বন্দনা-নৃত্য। চোখ ও মুখের, কণ্ঠদেশের এবং হাত ও পায়ের ছন্দময় লীলায়িত গতির দ্বারা এর অভিব্যক্তি। বিলম্বিত লয়ে ("তাম্ ঠিত্তাম্, তৈ ঠিত্তৈতে" এই বোল দিয়ে) আরম্ভ করে ক্রমে দ্রুত থেকে দ্রুততর লয়ে এগিয়ে গিয়ে, শেষে হাত দুটি মাথার উপরের দিকে জোড় করে, শরীরটাকে সামনের দিকে অল্প একটু ঝুঁকিয়ে, ভক্তি-দ্যোতক অঞ্জলি মুদ্রার দ্বারা এই নৃত্যের সমাপ্তি।

নৃত্যের দ্বিতীয় অঙ্গ **যতিস্বরম্** হচ্ছে যতি এবং স্বরের সংযোগ। যতি হচ্ছে সময়ের পরিমাণ ও স্বর হচ্ছে ধ্বনির বিচিত্র নক্সাগুলি। এই নৃত্যে মৃদঙ্গের বোলের সহযোগে পায়ের ছন্দময় গতি সাবলীল হয়, এই গতি আবার ধ্বনির বিচিত্র বুনুনির দ্বারা প্রাণবান হয়ে ওঠে।

এখানে নৃত্যের দু একটি বিশেষ পরিভাষা সম্বন্ধে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। ভরতনাট্যম্ নৃত্যের ভিত্তি হচ্ছে 'অদভু' (Adavu)। তালের আবর্তের সঙ্গে হাতের ও পায়ের সমভাবী সঞ্চালনকে 'অদভু' বলা হয়। নানা তাল আবর্তের সূত্রে গ্রথিত অদভুগুলিকে তিরুমানা বলা হয়। গানের যেমন ধুয়ো আছে, তেমনি নৃত্যের 'ধুয়ো' হচ্ছে তিরুমানা। এই তিরুমানাগুলি যেন নাকের অলঙ্কার। তিরুমানা দিয়ে নৃত্যের আরম্ভ এবং তার শেষ।

শুধু নিছক ধ্বনি থেকে নৃত্যশিল্পী এবার আমাদের নিয়ে যান শব্দের জগতে। সঙ্গীত এখানে বর্ণনামূলক হয়, এবং যথাযোগ্য ভঙ্গী ও মুদ্রাদ্বারা গানের শব্দগুলির অর্থ এই নৃত্যে

পরিস্ফুট করা হয়। কিন্তু, এখানেও বর্ণনামূলক ভঙ্গীগুলি নৃত্তের অর্থাৎ শুধু ছন্দের—শুধু তালের বিচিত্র বুনুনির দ্বারা অলঙ্কৃত করা হয়।

তৃতীয়টি হচ্ছে **বর্ণম্**। ভরতনাট্যম্ নৃত্যাঙ্গগুলির মধ্যে বর্ণম-ই হচ্ছে সবচেয়ে জটিল ও বিস্তারিত অংশ। তড়িৎ অঙ্গ-সঞ্চালন, অভিনয় এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল পদক্ষেপের ছন্দ এই তিনের অপূর্ব সমন্বয় হচ্ছে বর্ণম্। নৃত্যকলাকে আরও সম্পূর্ণ করেছেন এমন নৃত্যশিল্পীই বর্ণমকে যথার্থ রূপদান করতে পারেন।

অভিনয়ম্ হচ্ছে ভরতনাট্যমের চতুর্থ অংশ। এতে প্রধানতঃ অভিনয় দ্বারা গানের অর্থকে ভাবকে প্রকাশ করা হয়। দাসী-আট্টমের অধিকাংশ পদগুলি শৃঙ্গার-রসাত্মক। পরবর্তীকালে অনেক গান রাজামহারাজাদের স্তুতি ও প্রশংসার জন্য রচিত হওয়ায় এই নৃত্যকে অনেক নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও ভরতনাট্যমে অনেক অপূর্ব পদ রয়েছে যেগুলি কৃষ্ণের, নটরাজের, সুব্রহ্মণ্যমের ও অন্য দেবদেবতাদের স্তুতি ও বন্দনার জন্য রচিত। চোখের চাহনি, মুখের ভাব, হাতের মুদ্রা ও দেহের লীলায়িত ভঙ্গীর দ্বারা নৃত্যশিল্পী গানের ভাবকে ফুটিয়ে তোলেন এই নৃত্যে।

এর পঞ্চম ও শেষ অঙ্গ হচ্ছে **তিল্লানা**। এই নৃত্যটী হচ্ছে নিছক ছন্দ—নিছক তালেরই পরিকল্পনা। নারীর মোহনীয় রূপ, তার কমনীয়তা ও প্রাণ-উচ্ছলতা, তার লীলাচঞ্চল ভঙ্গিমা—তিল্লানা নৃত্য যেন এই সবেরই প্রকাশ। অতিদ্রুত পদ-সঞ্চালন, মূর্তির মত নিশ্চল দেহ-ভঙ্গিমা ও মনোহারী গতির বৈচিত্র্য—এই ত্রিধারার মিলনে তিল্লানা ভরতনাট্যম্ নৃত্যকে তার চরম পরিণতিতে পৌঁছে দেয়।

ভরতনাট্যমের নৃত্যগুলিকে এমন চমৎকার ভাবে গাঁথা হয়েছে যে মনে হয় যেন পদ্মের পাপড়ী একটী একটী করে খুলে যাচ্ছে, শেষ কালে সব পাপড়ীও নিমীলিত হয়ে যেন পূর্ণপদ্ম বিকশিত হল। (বালা সরস্বতী, শান্তারাও, রুক্মিনী দেবী, মৃণালিনী প্রভৃতি ভরতনাট্যমের অনেক সার্থক শিল্পী থাকা সত্ত্বেও আধুনিক কালে অনেক খেলো ভঙ্গী তাদের অনধিকার প্রবেশের দ্বারা ভরতনাট্যমকে কলুষিত করেছে। এ বিষয়ে আমাদের সজাগ ও সতর্ক হওয়া দরকার। ভরতনাট্যমের বিষয়বস্তু সংকীর্ণ হলেও ভারতবর্ষের প্রচলিত ক্লাসিকাল নৃত্যের মধ্যে ভরতনাট্যমেই নৃত্য-অনুশীলনের একটী সুসম্বদ্ধ প্রণালী আছে। আমাদের নৃত্য অনুশীলনের ভিত্তি করতে হবে ভরতনাট্যম্ কিন্তু বিষয়বস্তু ও টেক্‌নিকের ক্ষেত্রে এর সংকীর্ণতা দূর করে তার দিগন্তকে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত করতে হবে। আমাদের জীবনের সব অনুভূতি, তার বিচিত্র বর্ণ-সম্ভার, সবই হবে নৃত্যের বিষয়বস্তু—শুধু শৃঙ্গার ও ভক্তি নয়। তবেই নৃত্য জীবনের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চলতে পারবে ও রক্তে রসে নৃত্য-সৃষ্টি সার্থক হবে।

বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক'

রথীন্দ্রনাথ রায়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যক উপন্যাসটি এক নূতন ধরণের সাহিত্যসৃষ্টি। অবশ্য 'পথের পাঁচালী' রচয়িতা বিভূতিভূষণের সঙ্গেই পাঠক সাধারণের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর। 'পথের পাঁচালী'র অসাধারণ জনপ্রিয়তার একপাশে অরণ্যজীবনের এই মহাকাব্যটি যেন খানিকটা অনাদৃত, সাহিত্যবিচারের দিক থেকেও এযাবৎকাল এর পূর্ণাঙ্গ মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা হয়নি। অথচ বিষয়-বস্তুর অভিনবত্বে, পরিকল্পনার মৌলিকত্বে, প্রকৃতি ও মানুষের অদ্বৈত-সম্পর্ক রচনায় ও জীবনদর্শনের গভীরতায় 'আরণ্যক' একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। চাকুরী উপলক্ষ্যে নাঢ়া ও লবটুলিয়ার অরণ্য-প্রান্তর ও সেখানকার বিচিত্র জীবনধারার সঙ্গে যে নিবিড় একাত্মতা গ'ড়ে উঠেছিল, তাকে স্মৃতি-রোমন্থনের দুর্লভ ঐশ্বর্যে ভ'রে তুলেছেন শিল্পী। 'আরণ্যক' নূতন ধরণের উপন্যাস—নূতনত্ব এর বিষয়নির্বাচনে ও রচনারীতিতে।

'আরণ্যকে'র ভূমিকায় লেখক নিজেই মন্তব্য ক'রেছেন: "ইহা ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে, উপন্যাস।"—লেখকের এই কৈফিয়ৎ নিতান্ত অর্থহীন নয়। তাঁর এই উপন্যাসটি যে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের এ বিষয়ে তিনি অবহিত ছিলেন। তাছাড়া ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরীর সঙ্গেও হয়তো বা এর কিছু মিল আছে—এমন ধরণের একটি ধারণাও গ্রন্থকারের হয়তো মনে হ'য়ে থাকবে। 'আরণ্যকে'র ঔপন্যাসিক ধর্ম প্রসঙ্গে লেখকের এই মন্তব্যটি আলোচনার প্রয়োজন। ডায়েরীতে একটি ব্যক্তিপুরুষের আত্মগত খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ভাবনা, অথবা অনেকগুলি ঘটনার খণ্ডাংশ থাকে: সাধারণতঃ এই শ্রেণীর রচনায় কোন ধারাবাহিকতা থাকে না। ঘটনার পারম্পর্য ও সংহতি সাধারণতঃ এই শ্রেণীর রচনায় অনুপস্থিত। কেন্দ্রগত সংহতির অভাবে ঘটনাগুলি প্রধানতঃ খণ্ড কাহিনীমূলক বা Episodic হ'য়ে ওঠে। সচরাচর ডায়েরী সন-তারিখ চিহ্নিত হ'য়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ ডায়েরীতে এক প্রকার প্রত্যক্ষতা ও সত্যভাষণ থাকে—ব্যক্তিগত ভাবনা বা অভিজ্ঞতা-লব্ধ ঘটনাই প্রধানতঃ ডায়েরীর বিষয়বস্তু হ'য়ে থাকে। উপন্যাসের সবটুকুই রচনা, বিভূতিভূষণ বলেছেন "ধ্যানযোগম্"। ডায়েরীর লেখক সত্যভাষী, উপন্যাসের লেখক তুলনামূলকভাবে মূলতঃ কল্পনাশ্রয়ী ও উদ্ভাবনকৌশলী। ডায়েরীর তুলনায় উপন্যাস অনেক বেশী বস্তুধর্মান্বিত। ডায়েরী আত্মগত, উপন্যাস বস্তুধর্মী। উপন্যাসে আখ্যায়িকাগ্রথন বা প্লটরচনা একটি প্রধান বস্তু—ভালো উপন্যাসের আখ্যায়িকা হবে ঘনপিনদ্ধ ও কেন্দ্রসংহত। ডায়েরী শ্রেণীর রচনায় প্রসঙ্গচ্যুতি গুরুতর অপরাধ নয়—প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে লঘুপক্ষ বিচরণের মধ্যে খেয়াল খুশীর মেজাজটি সহজেই ধরা পড়ে। এ জাতীয় লেখাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'বাজে লেখা', প্রমথ চৌধুরী বলেছেন 'খেয়ালী রচনা।' উপন্যাসিকের পক্ষে এতখানি খেয়ালি হ'লে চলে না।

ভ্রমণকাহিনীর ঘটনাও ডায়েরীর মত প্রত্যক্ষগমা ও অভিজ্ঞতালব্ধ। ভ্রমণকাহিনী ভ্রমণেরই কাহিনী—ভ্রমণই মুখ্য, কাহিনী গৌণ। কিন্তু উপন্যাসে কাহিনীই মুখ্য, সেখানে কাহিনীরই স্বচ্ছন্দ ভ্রমণ। তবে ভ্রমণকাহিনীও উপন্যাসধর্মী হ'তে পারে, যেমন প্রবোধ সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে'। উপন্যাসের মূল কাহিনী ও তার কেন্দ্র ক'রে উপকাহিনীগুলির কেন্দ্র-সংহত ঐক্য ভ্রমণকাহিনী ও ডায়েরীতে মেলা কঠিন। গল্পাংশের প্রতি ভ্রমণকাহিনী রচয়িতা মমতাহীন—কারণ ভ্রমণের নেশাই এখানে মুখ্য। তাই ভ্রমণকাহিনীতে ভ্রাম্যমাণের ভ্রমণের নেশাকে তৃপ্ত করতে গিয়ে বহু কাহিনী আক্ষেপে আত্মহত্যা করে—ক্ষণিকের জন্য বহু কাব্যের উপেক্ষিত ও উপেক্ষিতার জন্ম হয়। গতির নেশায় ও চলমান জীবনের উন্মাদনায় চরিত্রকে পূর্ণাঙ্গ পরিণতিদানের অবকাশ কোথায়? এইজন্য উপন্যাস ঘটনা, চরিত্র ও জীবনজিজ্ঞাসা মিলিয়ে একটি সমগ্র জীবনের যে অখণ্ড রূপ উদ্‌ঘাটিত করে, ভ্রমণকাহিনীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। যেখানে ভ্রমণকাহিনী এই দাবী পূরণ ক'রেছে, সেখানে ভ্রমণকাহিনী উপন্যাসে পরিণত হ'য়েছে—যেমন শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'। ভ্রমণ কাহিনীর ডায়েরীর মতো আত্মনিষ্ঠ না হ'লেও উপন্যাসের চেয়ে অনেক বেশী আত্মগত ভাবনার অবকাশ সেখানে আছে। অবশ্য উপন্যাসেও ঔপন্যাসিকের বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টির আলোকপাত ঘটে, কিন্তু তার সঙ্গে ডায়েরীলেখক বা ভ্রমণকাহিনী রচয়িতার আত্মগত ভাবনার মৌলিক প্রভেদ আছে। উপন্যাসে বস্তুধর্মী জীবনরসকেই ঔপন্যাসিকের জীবন-জিজ্ঞাসা রসরূপ দেয়, ডায়েরী বা ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে লেখকের দৃষ্টিই সর্বত্র জগৎ ও জীবনের এক একটি নূতন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে।

বিভূতিভূষণ তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় যে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, তার থেকে বোঝা যায় যে আরণ্যকের মধ্যে ভ্রমণকাহিনী, ডায়েরী ও উপন্যাস—এই ত্রিধারাকে মিশিয়ে ফেলা সম্ভব—তাই লেখকের এই সতর্কবাণী। 'আরণ্যক' উপন্যাসে লেখক ডায়েরীলেখকের মতো উত্তমপুরুষ ব্যবহার ক'রেছেন। অনেক সময় কাহিনী বা পরিচ্ছেদের মধ্যে যে সুচিহ্নিত কাল-সঙ্কেত দিয়েছেন, তাতে খানিকটা ডায়েরীর ধর্ম ফুটে উঠেছে বই কি। ডায়েরীর মধ্যে যেমন আত্মগত ভাবনার স্বচ্ছন্দ বিচরণ লক্ষ্য করা যায়, 'আরণ্যকে' তার অভাব নেই। তথাপি 'আরণ্যক' ডায়েরীর খণ্ড-বিচ্ছিন্ন চিত্র ও ভাবনার সমষ্টিমাত্র নয়, একটি বিরাট আরণ্য-জগৎ ও বিভূতিভূষণের কবিজনোচিত প্রকৃতি-দৃষ্টি কাহিনীকে একটি ভাবসংহতি দিয়েছে। চরিত্রগুলি বিচিত্র হ'লেও বিচ্ছিন্ন নয়—এক বিশাল অরণ্যজগতের এক একটি অংশ। বিভূতিভূষণের ব্যাপক ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি মানুষ, ঘটনা ও প্রকৃতিকে একই সূত্রে সমন্বিত ক'রে একটি অখণ্ড জীবনরহস্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন ক'রেছে। বিভূতিভূষণের কল্পনাশক্তি প্রত্যক্ষ জগতের অনেক ওপরে এক নবীন 'কল্পলোক' সৃষ্টি ক'রেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডায়েরীর লেখক দৈনন্দিন সাময়িকতার সীমায় আবদ্ধ, কিন্তু বিভূতিভূষণ তাকেও ছাড়িয়ে রচনা ক'রেছেন নবীন 'কল্পলোক'।

'আরণ্যক' উপন্যাসে ভ্রমণকাহিনীর লক্ষণও কিছু কিছু মেলে। লেখক ভূমিকায় বলেছেন: "আরণ্যকের পটভূমি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। কুশীনদীর পারে এইরূপ দিগন্ত-বিস্তীর্ণ অরণ্য প্রান্তর

পূর্বে ছিল, এখনও আছে।"—লেখকের এই বিবৃতি খানিকটা সত্যাশ্রয়ী ভ্রমণবৃত্তান্তের স্বপক্ষে। কিন্তু গ্রন্থটি কি ভ্রমণ-মূখ্য? 'আরণ্যকে'র উদ্দেশ্য ভ্রমণ করা নয়, এমন কি পরিণতিও নয়। উদ্দেশ্য চাকুরী, পরিণতি বিগত দিনের স্বপ্ন-স্মৃতির রোমন্থন। ভ্রমণকাহিনীর মুখ্য উদ্দেশ্য ভ্রমণ, 'আরণ্যকে'র মুখ্য উদ্দেশ্য ভ্রমণ করা নয়। প্রত্যক্ষ ও বহুদৃষ্ট জগতকে ছাড়িয়ে একটি সমৃদ্ধ আকাশচারী প্রেক্ষাপট ও তার অধ্যাত্ম-বিস্তৃতিমণ্ডিত কবিজনোচিত বর্ণনা 'আরণ্যকে'র মূল সুর। ভ্রমণকাহিনীতে মুখ্য গতির রস, ভ্রমণকাহিনী রচয়িতা তাই 'পথের পাঁচালী'কার। কিন্তু আরণ্যক নীড়াশ্রয়ী মানুষের কল্প-বাসর। বিভূতিভূষণের মন যতই বিচরণ করুক না কেন, তাঁর চিত্তবৃত্তি যাযাবর নয়। তাই নীড়াশ্রয়ী মানুষের সুখদুঃখপূর্ণ সংসারকে কী মমতাময় দৃষ্টির সাহায্যেই না তিনি দেখেছেন। প্রবোধকুমার সান্যাল যথার্থ যাযাবর—এই যাযাবরবৃত্তি তাঁর উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনীর প্রধান লক্ষণ। কিন্তু বিভূতিভূষণ নীড়াশ্রয়ী মানুষ হ'য়েও কল্পলোকের স্বপ্ন দেখেন—তিনি কল্পপথের যাযাবর। 'আরণ্যকে'র মূল কাহিনীর সঙ্গে শাখা কাহিনীর যে সমন্বয় তা ভ্রমণকাহিনীতে মেলা কঠিন। মূল কাহিনীর নায়ক সীমাহীন বিশ্বপ্রকৃতি, উপকাহিনীতে অনেকগুলি ছোটগল্প—এই দুই কাহিনীরই ভাষ্যকার লেখক স্বয়ং। অরণ্যজগৎ যেন বৃহৎ বনস্পতি, উপকাহিনীর নরনারীরা যেন এক একটি শাখাবিহঙ্গ—এক একটি নীড় তাদের বিচিত্র সংসার। এই অখণ্ড জগতের ছবি এঁকেছেন অনাসক্ত শিল্পী বিভূতিভূষণ।

'আরণ্যক' যে ধরণের উপন্যাস, তা সাহিত্যজগতে বিরলদৃষ্ট। ইউরোপীয় কথাসাহিত্যের বিচিত্র শ্রেণীর মধ্যেও 'আরণ্যকে'র দোসর মেলা কঠিন। সাধারণতঃ উপন্যাস রচনায় তিনটি পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। 'ডাইরেক্ট' পদ্ধতি—এখানে ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিকের মতো ঘটনা বলে যান। তিনি নিজে শুধু বক্তা, তার অতিরিক্ত কিছু নন। অধিকাংশ উপন্যাসই এই পদ্ধতিতে লেখা। দ্বিতীয়তঃ আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। এখানে ঔপন্যাসিক উত্তমপুরুষে কথা বলেন। এবং তিনি শুধু উত্তমপুরুষে কথাই বলেন না, নিজেও একটি চরিত্র হয়ে ওঠেন। তৃতীয়তঃ কতকগুলি উপন্যাসে ঔপন্যাসিক পত্রব্যবহার অথবা দিনপঞ্জী সঙ্কলনের মধ্য দিয়ে ঘটনা ও চরিত্র ফুটিয়ে তোলেন। আরণ্যক রচনারীতির দিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই শ্রেণীর উপন্যাসের সঙ্গেও আরণ্যকের প্রচুর পার্থক্য আছে। আরণ্যক অনেকটা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস হ'লেও এর কথাবস্তু সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। মানব চরিত্র এখানে অনুপস্থিত না হ'লেও, এর সে রস উপন্যাসে গৌণ। বিশ্বপ্রকৃতিই 'আরণ্যক' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ও নায়ক। 'আরণ্যক' নূতন ধরণের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। ইংরেজ সমালোচক বলেন: "In adopting the autobiographical form, a novelist may frequently to bring all his materials naturally within the compass of the supposed narrators knowledge and power; he may sometime miss the true personal tone"—এক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ কোথাও তাঁর 'personal tone' হারান নি, অথচ তাতে এর সার্বজনীন রসাস্বাদনের কোন বাধা ঘটে না। আরণ্যক উপন্যাস নূতন ধরণের নূতন বিষয়ের।

॥ ২ ॥

'আরণ্যক' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এক আদিম ও বিশাল আরণ্যক প্রকৃতি। বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন সুর সংযোজন ক'রেছেন। সমস্যাকাতর, যন্ত্রজর্জর শহরতলীর নানামুখী বিকৃতি ও অবক্ষয়ের চিত্র যে যুগে প্রধান হ'য়ে উঠেছিল,—সেখানে বিভূতিভূষণ এক আত্মমুগ্ধ মৃত্তিকাশ্রয়ী সহজ জীবনের পিপাসাকে জয়যুক্ত ক'রেছেন। বিশ্বপ্রকৃতির সেই এক অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ড বিভূতিভূষণের শিল্পীমনে অভিনব চেতনার সঞ্চার ক'রেছিল। 'আরণ্যক' প্রকৃতিপ্রেমিক বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ জীবনবাণী। এখানে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির বহিরাশ্রয়ী সাধারণ বর্ণনার মধ্যেই তাঁর কবিশক্তিকে সীমাবদ্ধ ক'রেন নি, তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি প্রকৃতির মর্মবাণীকে উদ্‌ঘাটিত ক'রেছে। বাংলা সাহিত্যে এক রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মর্মবাণী এমন আন্তরিকভাবে আর কারও রচনায় ধরা দেয় নি।

রোম্যান্টিক যুগের ইংরেজ কবিদের প্রকৃতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টির কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বর্তমানকালের একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক ব'লেছেন: They (রোম্যান্টিক কবিরা) all had a deep interest in Nature, not as a centre of beautful scenes, but as an informing and spiritual influence on life. It was as if frightened by the coming of industrialism and the nightmare town of industry, they were turning the Nature for protection. Or as if with the declining strength of traditional religious belief, men were making religion from the spirituality of their experiences." সমালোচকের মতে রোম্যান্টিক যুগের কবিদের প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার বৈশিষ্ট্য মূলতঃ তিনটি: তাঁরা প্রকৃতির বহিরাশ্রয়ী রূপের চেয়ে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত গূঢ় শক্তির সঙ্গে একপ্রকার আত্মিক যোগ অনুভব ক'রেছেন। দ্বিতীয়তঃ, যন্ত্র-সভ্যতার যুগে তাঁরা মুক্ত প্রকৃতির বুকে আশ্রয় খুঁজেছেন। তৃতীয়তঃ, প্রকৃতিকে অবলম্বন ক'রে তাঁরা নূতন এক ধরণের 'প্রকৃতি-তত্ত্ব আবিষ্কার' ক'রেছেন।

লবটুলিয়া বইহারের অরণ্যানীতে, বনপাহাড়ে, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টে, মহালিখারূপ পাহাড়ের পাদদেশে, সরস্বতী কুণ্ডার ধারে স্বপ্নমুগ্ধ লেখক প্রকৃতির নানা রূপচিত্র ফুটিয়েছেন। বর্ণনার বৈচিত্র্যের মধ্যে বর্ণ ও স্পর্শাতুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ সহজ আনন্দরসে উজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে। বনপাহাড়ের মুক্ত সৌন্দর্য, দিগন্ত-বিসর্পিত উদাস অরণ্যানী, সূর্যাস্তের রঙ, রাঙা পলাশফুলের দীপ্তি, দুগ্ধ-শুভ্র কাণ্ডে হলুদ রঙের সূর্যমুখী, রাঙা মাটির জমি, পুষ্পিত কদম ও পিয়ালের সমারোহ, নীরব নিশীথে পীতাভ জ্যোৎস্নার অপার্থিব শিহরণ—এ যেন বর্ণের প্লাবন। রূপের পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অনুভব 'আরণ্যকে'র ছত্রে ছত্রে। কোথাও খররৌদ্রোজ্জ্বল বনাবৃত দীর্ঘ শৈলমালা, কোথাও পুষ্পিত শাল পিয়ালমঞ্জরীর গন্ধখচিত ছায়া—বর্ণগন্ধের জগৎ—এ যেন অস্কার ওয়াইল্ড-বর্ণিত 'suffocating sensuousness'-এর স্বপ্নরাজ্য। বিভূতিভূষণ প্রকৃতির দৃশ্যসৌন্দর্য ও বর্ণবিস্তারী মোহাবেশ চিত্রণে যে ইন্দ্রিয়-সচেতনার পরিচয় দিয়েছেন তা অনন্যসাধারণ। তাঁর অধিকাংশ

উপন্যাস ও ছোটগল্পে অজস্র নাম-না-জানা ফুল, নাম-না-জানা পাখীর পরিচিতি। 'আরণ্যক' উপন্যাসে প্রকৃতি-চিত্র বিস্ময়কর সন্দেহ নেই, কিন্তু এই প্রকৃতির একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রস-সত্তা আছে, যা বিভূতিভূষণ ছাড়া অপর কারও পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। বনপ্রকৃতির নির্জনসৌন্দর্য, লতাগুল্মের অপার্থিব রহস্য প্রভৃতি চিত্র-রস সমৃদ্ধ। কিন্তু এই চিত্রধর্মিতাই 'আরণ্যকে'র শেষকথা নয়।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর 'টিনটার্ন এ্যাবে' কবিতায় তাঁর প্রকৃতিদর্শনের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন :

"The sounding cataract
Haunted me like a passion ; the tall rock,
The mountain and the deep gloomy wood
Their colours and their form were to me
An appetite—a feeling and a love
That had no new of a remoter charm
By thought supplied, nor any interest,
Unborrowed from the eye."

নিছক প্রকৃতি বর্ণনা ওয়ার্ডসওয়ার্থ কথিত 'colour' ও 'form'-এর জগৎ। প্রকৃতি চেতনার প্রথম স্তরে কবি রূপ ও বর্ণের আনুগত্য অস্বীকার করতে পারেন নি। পরবর্তীকালে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বর্ণগন্ধের অন্তরালে এক মহাসত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন—সে এক অতিশুভ্র জ্যোতির্ময় চৈতন্যশক্তি। ক্রমশঃ তিনি প্রকৃতির এক জাতীয় ঐশীশক্তি অনুভব ক'রেছিলেন। তিনি বেশীদিন বর্ণগন্ধের কারাগারে আবদ্ধ থাকতে পারেন নি।

বিভূতিভূষণও বর্ণগন্ধের রূপলোকের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেন নি। এক অতীন্দ্রিয় আবেদন তাঁর স্বপ্নাবিষ্ট চোখের সামনে নূতন পৃথিবীর ছবি তুলে ধরেছে। অরণ্যকুহেলিকা পার হ'য়ে মরলোক ছাড়িয়ে বিভূতিভূষণ অনন্ত নক্ষত্রলোকের পরিষদ হ'য়ে উঠেছেন : "সে যেন খুব উচ্চাঙ্গের নীরব সঙ্গীত—নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোর তলে জ্যোৎস্নারাত্রের অবাস্তবতায়, ঝিল্লীর তানে ধাবমান উল্কার অগ্নিপুচ্ছের জ্যোতিতে তাহার লয়-সঙ্গতি।" জনশূন্য বিশাল লবটুলিয়া বহিরাবের দীর্ঘ বনঝাউ ও কাশবন অবলম্বন করে লেখকের মনে এক অসীম রহস্যানুভূতি সঞ্চারিত হ'য়েছে। এ সব বর্ণনা 'ল্যাণ্ডস্কেপ' মাত্র নয়, চিত্রচতুর শিল্পীর বর্ণ-চাতুর্যও নয়—অসীম রহস্যের গূঢ় অনুভব। লেখক বলেছেন : "কিন্তু যে কথাটা বার বার নানা ভাবে বলিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কোনবারই ঠিকমত বুঝাইতে পারিতেছি না, সেটা হইতেছে প্রকৃতির একটা রহস্যময় অসীমতার, দূরধিগম্যতার, বিরাটত্বের ও ভয়াল গা-ছমছমকরানো সৌন্দর্যের দিকটা।...জনশূন্য বিশাল লবটুলিয়া বহিরাবের দিগন্তব্যাপী দীর্ঘবনঝাউ ও কাশের বনে নিস্তব্ধ অপরাহ্নে একাযোড়ারা বসিয়া এখানকার প্রকৃতির এই রূপ আমার সারা মনকে অসীম রহস্যানুভূতিতে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে, কখনও তাহা আসিয়াছে ভয়ের রূপে, কখনও আসিয়াছে কত মধুময় স্বপ্ন, দেশ-বিদেশের নর-নারীর বেদনার রূপে।"—প্রকৃতির বাইরের রূপাবরণ সরিয়ে দিয়ে তার দুরধিগম্য রহস্যময়তার দিক

বিভূতিভূষণ দেখেছেন—মিষ্টিক সাধকের মতো দেখেছেন। বিভূতিভূষণ প্রকৃতির মধ্যে একটি রহস্য ভেদকারী অসীম রহস্যজিজ্ঞাসায় ব্যাকুল হয়েছেন। যাঁরা প্রকৃতিবর্ণনায় এই প্রকার cosmic vision-এর অধিকারী তাঁরা বহিঃসৌন্দর্যের সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ থাকতে পারেন না, যেমন পারেন নি ওয়ার্ডসওয়ার্থ, যেমন পারেন নি রবীন্দ্রনাথ। উর্ধ্বের আকাশের নক্ষত্রকাহিনী থেকে নিম্ন সমতলের অপার্থিব জ্যোৎস্না এক অসাধারণ কবিদৃষ্টির ঋজুরেখায় গাঁথা।

বিভূতিভূষণ পার্থিব আরণ্যক জগতের অন্তরালে এক ঐশী শক্তি ও অপার্থিব দেবলোকের সান্নিধ্য অনুভব ক'রেছেন : "পরিপূর্ণ ছায়াহীন জলের ওপর-পড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় প্রতিফলিত হইয়াছে অপার্থিব দেবলোকের জ্যোৎস্না ; ভোমরা লতার শাদা ফুলে ছাওয়া বড় বড় বনস্পতিশীর্ষে জ্যোৎস্না পড়িয়া, মনে হইতেছে গাছে গাছে পরীদের শুভ্রবস্ত্র উড়িতেছে।"—অপার্থিব দেবলোকের স্বপ্ন, সুর-বালিকাদের নৈশস্নান-বিলাস কীট্‌সীয় সৌন্দর্যলোক উদ্‌ঘাটিত ক'রেছে। কীট্‌স তাঁর সঙ্কীর্ণ দেশ-কালের সীমায় বসে কত বিস্তৃত প্রায় মৃতযুগের স্বপ্নকাহিনীই না শুনেছিলেন!—কীটসের পৃথিবী সুরলোকবিহারের পৃথিবী,—"The poetry of the earth is never dead !" এক রূপাতীত অতীন্দ্রিয় ভাবুকতা তাঁকে নিছক বহিরাশ্রয়ী প্রকৃতির 'ফটোগ্রাফার' করে তোলে নি, প্রকৃতির মর্মমূলের এক অব্যক্ত ভাষণ উদ্‌ঘাটিত ক'রেছে।

প্রকৃতির আদিম দুরধিগম্য অসম্পৃক্ত নগ্নসত্তা লেখককে ভয়বিস্ময়ে মাঝে মাঝে বিহ্বল ক'রে তুলেছে। সেখানে কত অতিপ্রাকৃত কাহিনী, অরণ্য রাজ্যের কত স্বপ্ন-সুন্দর রূপকথা, সেখানকার লোকজীবনের অজস্র জনশ্রুতি বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মনকেও নিগূঢ়ভাবে আকর্ষণ ক'রেছে। বিভূতিভূষণ কোলরিজের মতো অতিপ্রাকৃতকে সত্যে পরিণত ক'রেছেন ও ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধির অধিকারী হয়েও প্রকৃতির এক আদিম, অসংস্কৃত, অরূপ মূর্তিকে ধ্যানলোকের সামগ্রী ক'রে তুলেছেন। বিভূতিভূষণের দৃষ্টি বর্ণগন্ধ রূপ-বিহ্বল জগৎ ছাড়িয়া এক অদৃশ্য জগতের সন্ধানী—এ যেন—

"When the light of sense
Goes out but with a flash that has revealed
The invisible."

বিভূতিভূষণ বুদ্ধির আলো নিভিয়ে এমন একটি অতীন্দ্রিয় অনুভববেদ্য অসীম সৌন্দর্যলোকের ধ্যান ক'রেছেন। মহালিখারূরে পাহাড় ও অরণ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিভূতিভূষণের আত্মমুগ্ধ ধ্যান-দৃষ্টি লোকাতীতলোকের সন্ধান ক'রেছে—আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট বাস্তব পৃথিবীও স্বপ্নের মতো মনে হয় : "জ্যোৎস্না আরও ফুটিয়াছে, নক্ষত্রদল জ্যোৎস্নালোকে প্রায় অদৃশ্য, চারিদিকে চাহিয়া মনে হয়, এ সে পৃথিবী নয়,—যাহাকে জানিতাম, এ স্বপ্নভূমি, এই দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নায় অপার্থিব জীবেরা এখানে নামে গভীর রাত্রে, তারা তপস্যার বস্তু, কল্পনা ও স্বপ্নের বস্তু। ফুল যারা ভালবাসে না, সুন্দরকে চেনে না, দিগন্তলয় রেখা যাকে কখনও হাতছানি দিয়া ডাকে না, তাহাদের কাছে পৃথিবী ধরা দেয় না কোনকালেই।"—পরিচিত পৃথিবীর মধ্যে অপার্থিব রূপলোকের আস্বাদন

বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচেতনার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। তিনি পার্থিবকে অপার্থিব করেন, তেমনি অপার্থিবও তাঁর কাছে অবাস্তব নয়—এই দুই পৃথিবী বিভূতিভূষণের বিশ্বপ্রকৃতির বর্ণনায় এক হ'য়ে উঠেছে। মুগ্ধ বিশ্বাস ও স্বপ্নাবিষ্ট গূঢ় ভাবুকতা বিভূতিভূষণকে এক কল্পপৃথিবীর মহাভাষ্যকারে পরিণত করেছে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

ময়লা মলাট

হীরেন বসু

সব বদলে গেছে। সে শহর আর নেই। সেসব সময় যেন বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে গেছে। তখন লোকে কলকাতা ছাড়বার জন্যে অস্থির। সকলেই ছুটেছে শহর ছেড়ে অন্য-কোন আশ্রয়ের সন্ধানে। আশ্রয়ের অভাবে ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমও ভাল। তবু কলকাতা ছাড়তে হবে। কিন্তু এখন একেবারে উল্টো। প্রথম যখন কলকাতায় এল সোমনাথ, ওর দম বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা। কাতারে কাতারে শুধু লোক। কিন্তু কি নয়নাভিরাম দৃশ্য! শুধু কালো-কালো মাথা। নড়ছে, ফিরছে, চলে বেড়াচ্ছে। ডবলডেকারে যেতে যেতে আশ্চর্য্য হয়ে দেখল সোমনাথ। তারপর গন্তব্য স্থান আসতেই নেমে পড়ল। কিন্তু নেমেই সামনে পরিচিত মুখ। মনে পড়ল কতকাল সে কলকাতা-ছাড়া। এ পরিচিত মুখ সে অনেক দিন দেখেনি। হ্যাঁ, বেশ কয়েক বছর। কিন্তু সমীর না? সমীরই তো। মুখখানা পাশ থেকে দেখা যাচ্ছিল, এখন সামনে ফেরাতে স্পষ্টই বোঝা গেল সমীর মিত্র। ততক্ষণে সমীর ওকে দেখতে পেয়েছে।

এগিয়ে এসে বললে, 'কি ব্যাপার, কবে এলি?'

সোমনাথ ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। বেশ মোটা হয়েছে। গোলগাল চেহারায় ট্রাউজার পরে কেমন যেন অবাঙালী বোধ হচ্ছে।

'কি দেখছিস?' হেসে সমীর বললে, 'খুব মুটিয়েছি, না?'

অল্প হাসল সোমনাথ। সমীরও হাসল, হেসে বললে, 'বছর দুয়েক হল সংসার পেতে বসেছি। আয় একদিন সন্ধ্যার পর। অনেক দিন পরে কলকাতায় এলি। কতদিন তোর সঙ্গে দেখা হয়নি।'

সোমনাথও তাই চাইছিল। সে নিজে বিবাহিত জীবনে সুখী হয় নি। তাই অপরে বিয়ে করেছে শুনলেই জানতে ইচ্ছে করে তাদের মনের মিল হয়েছে কিনা। বিশেষ করে সমীর সম্পর্কে কৌতূহল তো বেশী হবেই। কলেজে ওদের দুজনের ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশী। তাছাড়া দীর্ঘ কাল পরে দুই বন্ধুর সাক্ষাৎ হয়েছে। দুজনেরই মনে চাইছে অতীতস্মৃতির রোমন্থন করতে। কিন্তু এই রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তা সম্ভব নয়। তার জন্যে চাই নিভৃতি।

সোমনাথ জিজ্ঞেস করলে, 'তুই সেই বাড়িতেই আছিস তো?'

সমীর বললে, 'না, এখন থাকি চিত্তরঞ্জন এ্যাভিন্যুর একটা ফ্ল্যাটে। ঠিকানাটা তোকে লিখে দিচ্ছি।'

সাদা কাগজ না পেয়ে বাসের টিকিটের পেছনে ঠিকানাটা লিখে দিল সমীর। বললে, 'সেকেণ্ড ফ্লোর। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডান দিকে দরোজা।'

তারপর দুই বন্ধুর ছাড়াছাড়ি হল শীগ্‌গিরই দেখা হচ্ছে এমন আশা নিয়ে।

কয়েকদিন কেটে গেল। সমীরের বাড়ী যাবার একেবারে সময় পেল না সোমনাথ। কলকাতায় এসেছে সে এখানকার একটি কলেজে প্রফেসারির চেষ্টায়। আবেদনপত্র আগেই পাঠিয়েছে। তাতে নিজের অভিজ্ঞতার কথা লিখেও জানিয়েছে। কিন্তু আজকের দিনে শুধু এতেই কাজ হয় না। বেশী দরকার তদ্বির-তদারকের। সোমনাথ তা ভাল করেই জানে, আর তাই সে ছুটে এসেছে।

মফস্বল কলেজে ইচ্ছে করেই সোমনাথ প্রফেসারি নিয়েছিল।

সে প্রায় বারো বছর আগকার কথা। সবেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ করেছে। একেবারে ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট না করলেও কলকাতার কলেজে একটা চাকুরী জুটে যেত নিশ্চয়ই। তার মুরুব্বির অভাব ছিল না। কিন্তু একটা ঘটনায় সোমনাথের মন বদলে গেল।

ঘটনাটা হচ্ছে তার মায়ের আকস্মিক মৃত্যু। এখানে বলা দরকার সোমনাথের বাবা মারা যান তার খুব ছেলে বয়সে। সোমনাথ একা। তার অন্য কোন ভাইবোন নেই। আত্মীয়-স্বজনও বিশেষ কিছু ছিল না। যারা ছিল সোমনাথের বাবা মারা যাবার পর আর ওমুখো হত না। রমানাথ মিত্তির রেখে গিয়েছিলেন একটি ছোট বাড়ী। একখানি ঘরে নিজেরা থেকে বাকীগুলো ভাড়া দিয়ে মনোরমা দুজনের ছোট সংসার কোন রকমে চালিয়ে দিতেন। সোমনাথ ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল। প্রাইমারী স্কুল থেকে হাই স্কুল, তারপর কলেজ, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সোমনাথের প্রায় সমস্ত জীবনটা আবর্তিত তার মাকে কেন্দ্র করে। মনোরমা সব সময় তাকে আগলে থাকতেন। সেইজন্যেই তার প্রকৃতিটা হয়ে উঠেছিল লাজুক। স্কুলে দু-একজনের সঙ্গে ভাব ছিল, কলেজে ঢোকবার পর তারা হারিয়ে গেল। একজনের সঙ্গে কিন্তু পরবর্তী কালেও তার যোগাযোগ ছিল। তিনি অবনী মাষ্টার। ইংরিজি পড়তেন।

কলেজে প্রথম দু বছর বেশ আনন্দেই কাটল। কো-এডুকেশন কলেজ। হৈ-হুল্লোড়। অনেক বন্ধুবান্ধব জুটল। কিন্তু কারো সঙ্গেই অন্তরের যোগ হয়নি। থার্ড ইয়ারে এল সমীর। ভাব হতে দেরী হল না। এবং অবিলম্বে তা অন্তরঙ্গতায় পৌঁছোলো।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে দুই বন্ধু যখন বেরোল, তারপরেই কলকাতায় আতঙ্কের ছায়া পড়েছে। আকাশ বিমানের গর্জন-ধ্বনিতে মুখর। রাত্রে লেপের মধ্যে শুয়ে কানে আসে শত্রুপক্ষের বোমারু বিমানের গুরু গুরু শব্দ। অমনি শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে ছুটতে হয় একতলায়।

সেই সময়েই মনোরমার হঠাৎ অসুখ করল। কি অসুখ বোঝবার আগেই তাঁর দেহ হিম-শীতল হয়ে গেল। ডাক্তার আনতে গিয়েছিল সোমনাথ। কিন্তু বড় দেরীতে, আর আনলও দেরী করে। তাও সাধারণ একজন ডাক্তার। কারণ নামজাদার অনেকেই তখন নিজের জীবন হাতের মুঠোয় করে কলকাতা ছেড়েছেন।

মায়ের মৃত্যুতে সোমনাথ একেবারে মুসড়ে পড়ল। কয়েকদিন বাড়ীর বার হল না। অন্ধকার

ঘরে শুয়ে চিন্তার খেয়ায় চড়ে বসল। সমীর আসে। যথাসাধ্য সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। আরো দু-একজন বন্ধু আসে। কিন্তু সোমনাথের কোন ভাবান্তর নেই।

শেষ পর্য্যন্ত ভাবান্তর ঘটল শরীর দুর্ব্বল হয়ে পড়তে। মায়ের শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়ে মফস্বল কলেজে চাকরীর চেষ্টা করতে লাগল সোমনাথ। অবিলম্বে আহ্বান এল।

কলকাতার বাইরে গিয়ে সোমনাথ প্রথম প্রথম সমীরকে দু-একখানা চিঠি লিখেছিল। তারপর চুপচাপ। আর কোন খোঁজ-খবর নেই। ওখানেই বিয়ে করল বটে, কিন্তু জীবনে সুখী হতে পারল না। নানা কারণে ওখানে আর মন টিকছে না। তাই সে চলে আসতে চায়। এখন কলকাতা আসা তারই ভূমিকা।

সমীরের সঙ্গে পথে হঠাৎ দেখা হবার পর কিছুদিন কাজের ঘূর্ণিপাকে জড়িয়ে রইল সোমনাথ। তারপর একদিন অবসর মিলল। এখানকার কলেজে কাজ ঠিক হয়ে গেছে। সব পাট তুলে আনতে হবে।

তার আগে একবার সমীরের সঙ্গে দেখা করা উচিত।

সন্ধ্যা হয়-হয়। সোমনাথ ঠিকানা দেখে সমীরের ফ্ল্যাটে হাজির হল। কড়াটা আস্তে নাড়তেই দরজা খুলে গেল। অবাক সোমনাথ। বললে, 'একি! তুমি!'

মিনতিও বললে, 'একি! তুমি!'

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে সোমনাথ বললে, 'সমীর আমার বন্ধু।'

মিনতিও নিজেকে সামলে নিয়েছিল। ধীরে ধীরে বললে, 'উনি এখনও অফিস থেকে আসেন নি। ঘরে এসে বসুন। এখুনি ফিরবেন।'

সোমনাথকে নিয়ে সামনের ঘরে বসাল মিনতি।

'বসুন, আসছি।' বলে মিনতি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সোমনাথ বসে-বসে ওর চলে-যাওয়া দেখল। তারপর চোখ ফেরাল ঘরের দিকে।

মাঝারি ঘর। কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জিনিষপত্র সুন্দরভাবে গোছানো রয়েছে। পারিপাটি। একপাশে ছোট টেবিল আর দুখানা চেয়ার। তারই একটিতে সোমনাথ আশ্রয় নিয়েছিল। টেবিল ঢাকা রয়েছে গোরুয়া-রঙের কাজ-করা চাদরে। একপাশে থান চারেক বই, আর একপাশে একটি ছোট রেডিও-সেট। ও কোণে পাশাপাশি দুটি ছোট আলমারি। বিভিন্ন ধরণের বইয়ে ভর্ত্তি। সোমনাথ মনে মনে ভাবল—সমীর তাহলে পড়াশুনোর সঙ্গে সম্পর্ক এখনো রেখেছে।

এ ঘরের সর্ব্বত্র কল্যাণী-হস্তের শ্রী দেখে সোমনাথের নিজের ঘরের কথা মনে পড়ল।

সমীর কখন ফিরবে আফিস থেকে? ঘড়িতে দেখল ছটা বেজে গেছে।

তাহলে মিনতি সমীরের স্ত্রী? সেই মিনতি—অবনী মাষ্টারের মেয়ে। রোগা ঢ্যাঙা শুকনো চেহারা। শরীরে বিন্দুমাত্র লাবণ্য নেই। কিন্তু স্নেহপরায়ণ ছিল। অবনী মাষ্টারের মত অগোছালো লোককেও সামলে নিয়ে চলত ঠিক। সতের বছরের মেয়ে হলেও গিন্নিপনায় ছিল পাকা। মা-মরা মেয়ে। অবনী মাষ্টারের চোখের মণি। পড়াশুনা বেশি দূর এগোয় নি মিনতির।

সেজন্যে অবনী মাষ্টারের মনে ক্ষোভ ছিল। মাঝে মাঝে সোমনাথকে বলতেন, 'মেয়েটাকে ভাল করে লেখাপড়া শেখান হল না। শুধু গিন্নিপনাই শিখল। কি-যে ও করবে জীবনে।' এরপর খেদোক্তি, 'বয়েস হয়ে যাচ্ছে। অথচ বিয়ে দেবার ক্ষমতা নেই। চেহারাও ভাল নয়। কি করি?'

অবনী মাষ্টার ছিলেন একেবারে বইয়ের পোকা। সেই জন্যেই সোমনাথের সঙ্গে তাঁর সম্প্রীতি গড়ে উঠেছিল। সোমনাথের রুচি গঠিত হয়েছে প্রায় অবনী মাষ্টারের প্রভাবেই। কোন বই সম্পর্কে তাঁর ভাল-লাগা মন্দ-লাগা ওর ওপর বর্তেছে। গ্রাজুয়েটও ছিলেন না, কিন্তু পড়াশুনো করেছিলেন অনেক, জানতেন অনেক কিছু। তাঁর ঘর-বোঝাই বইয়ের স্তূপ ছিল। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে থাকত। রাখবার ভাল জায়গা ছিল না। স্কুলের সময়টুকু ছাড়া বাকী সব সময়ই বইয়ে ডুবে থাকতেন।

আর মিনতি তাঁর ওপর খবরদারি করত। তিনি স্নেহের হাসি হাসতেন। তাঁর মুখে হাসি সর্বদা লেগে থাকত।

সেই অবনী মাষ্টারকে একদিন গম্ভীর দেখল সোমনাথ। তখন তার ফিফ্‌থ্ ইয়ার চলছে। কলেজ থেকে ফিরে অবনী মাষ্টারের বাড়ী এসেছিল। প্রায় রোজ বিকেলে যেমন আসে। অবনী মাষ্টার তক্তাপোষে বসেছিলেন। সোমনাথ একপাশে গিয়ে বসল।

অবনী মাষ্টার হঠাৎ বললেন, 'সোমনাথ—তুমি আমার ছাত্র?'

এমন প্রশ্ন করার কারণ সোমনাথ খুঁজে পেল না। প্রথমে হতবাক। তারপরে সামলে নিয়ে ঘাড় নাড়ল।

'আমাকে শ্রদ্ধা কর?' বড় বড় চোখে সোমনাথের দিকে তাকালেন অবনী মাষ্টার।

আরো আশ্চর্য সোমনাথ। কিন্তু এবার তার মুখ খুলল। কারণ যে-দুজনের ওপর তার গভীর শ্রদ্ধা ছিল অবনী মাষ্টার তাঁদের মধ্যে একজন। উচ্ছ্বসিত হয়ে সে ওকথাই বলল।

এবার অবনী মাষ্টারের কণ্ঠ করুণ শোনাল, 'তুমি আমায় কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবে?'

উত্তর দিতে পারল না সোমনাথ। মানসপটে মিনতির ছবি ভেসে উঠল। নৈরাশ্যজনক। সোমনাথের মনে কত উচ্চাশা। সরকারী কলেজে অধ্যাপনা। বিদুষী লাবণ্যময়ী স্ত্রী। অক্সফোর্ডের ডক্টরেট হওয়া। মিনতি কি তার গৃহবধূর আসন নিতে পারে? একথা সে কখনও কল্পনাও করেনি।

কিন্তু সোজাসুজি না বলতে তার মুখে বাধল। তাই বললে, 'মার অনুমতি ছাড়া তো কিছু বলতে পারছি না—'

'ঠিক কথা। আমারই অন্যায় হয়েছে তোমার মাকে না বলে তোমাকে বলা।' ঘাড় নাড়তে নাড়তে অবনী মাষ্টার বললেন।

সোমনাথের চুপ করে থাকা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

'তাহলে একদিন তোমার মার কাছে যেতে হয়।

এবার বিপদে পড়ল সোমনাথ। মা যদি রাজী হয়ে যান।

'আজ আমি মাকে গিয়ে বলব। পরে আপনাকে জানাব।'

'আচ্ছা।' বলে অবনী মাষ্টার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

সোমনাথ চুপ করে বসে রইল বটে কিন্তু সে-মুহূর্তে তার দৌড়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল।

এরপর নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেলেন অবনী মাষ্টার।

সোমনাথের মনে অনেক জিজ্ঞাসা উঁকি দিচ্ছিল। অনেক ভেবেও সে বুঝতে পারল না মিনতির বিয়ের জন্য অবনী মাষ্টার কেন এত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। তাঁর আরো অনেক ছাত্র আছে। কিন্তু সোমনাথের কাছেই বা কেন মিনতির বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। অবশ্য এও সত্যি যে তাঁর আর কোন ছাত্রের সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল না। তার জন্যে সোমনাথ মনে মনে গর্ব অনুভব করত।

আজ সে একটু আপশোষ করতে লাগল বৈকি। বর্তমান অবস্থা সৃষ্টির জন্যে নিজেকে হাজারবার দোষ দিল। পরক্ষণেই নিজের মনে ধিক্কার এল। এ কি ভাবছে সে। না হয় মিনতিকে নিজের যোগ্য মনে করে না। তার জন্যে অবনী মাষ্টারের ওপর দোষ দিয়ে লাভ কি। উনি অতশত ভেবে বিয়ের প্রস্তাব করেননি নিশ্চয়। কারণ সংসার অমন সম্পর্কে সচেতনতা অবনী মাষ্টারের কোন কালই দেখেনি। হয়ত আজই হঠাৎ তাঁর খেয়াল হয়েছে, কিম্বা কেউ মনে করিয়ে দিয়েছে যে মিনতির বয়স হয়ে যাচ্ছে, বিয়ে দিতে হবে। তাইত, ভাবনার কথা। পাত্র চাই। তারপরই মনে পড়ে গেল হাতের কাছেই ভাল পাত্র রয়েছে। সোমনাথ। হীরের টুকরো ছেলে। মিনতির উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু এ সব কথা কাল সকালে উঠেই হয়ত ভুলে যাবেন।

সোমনাথ যা ভেবেছিল ঠিক তাই। অবনী মাষ্টারকে ধ্যানমগ্ন দেখে সে যখন আস্তে আস্তে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে সদর দরজার দিকে এগোচ্ছিল, মিনতি তাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল।

সোমনাথ খানিকটা বিরক্তই হয়েছিল।

কিন্তু মিনতি ঠোঁট চেপে মুচকে মুচকে হাসছে। দেখে সোমনাথ আরও বিরক্ত হল। কিন্তু বিরক্তি চেপে বললে, 'কি, ডেকেছিলে কেন?"

'চা খেয়ে যাবে না?'

'না বাড়ী গিয়ে খাব।'

সোমনাথ দাঁড়িয়েছিল ঘরের মধ্যে, আর মিনতি দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে কাপড়ের খুঁট আঙুলে জড়াচ্ছিল। সোমনাথের ভাব দেখেই তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে।

সোমনাথ একবার মিনতির আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিল। এই মেয়ে। পরিপূর্ণ যৌবনেও বিশেষ চেহারার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সেই কাঠির মত রোগা। আর ময়লা রঙ। এ মেয়েকে সোমনাথ মানসী রূপে কল্পনা কোন দুর্বল মুহূর্তেও করবে না।

বোধহয় সোমনাথের মনের ছবি মিনতির চোখে ধরা পড়ে গেছে। তার মুখখানা নিমেষে শক্ত হয়ে উঠল। কঠিন কণ্ঠে সে বললে, 'আপনাকে আপ্যায়ন করার জন্যে আমি চা খাওয়ার

কথা বলিনি। নেহাৎ কর্তব্যবোধ। আর আপনি যে জন্যে চিন্তিত সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন। বাবা কালই ও কথা ভুলে যাবেন। আপনাকে গুরুবাক্য অবহেলা করতে হবে না।

মিনতির কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়েছিল।

কিন্তু আজ জীবনের পথে অনেকখানি এগিয়ে এসে এই সন্ধ্যায় সোমনাথের মনে হল যে, মিনতির কথা সত্যি না হলেই যেন ভাল হত। সমীরের গোছানো সংসার না দেখলে হয়ত এ চিন্তা তার মনে কোনদিন আসত না।

হঠাৎ সোমনাথের খেয়াল হল চিন্তার সূত্র ধরে সে অনেক দূরে চলে গেছে। সচেতন হতে শুনল মিনতি বলছে, 'উনি ত এখনও এলেন না। কেন দেরী হচ্ছে কে জানে। ঠাকুর চা জলখাবার নিয়ে আসছে। চা-টা খেয়ে আপনি আরো খানিক অপেক্ষা করুন। তার মধ্যে উনি নিশ্চয় এসে যাবেন।'

মুখ তুলে তাকাল সোমনাথ। মিনতিও দেখল। তারপর হাসল মিনতি। উজ্জ্বল প্রশান্ত হাসি। কিন্তু সোমনাথের মনে ক্রেমন যেন বাঙ্গাত্মক বলে মনে হল। সত্যি তা নয়। তবু তার বুকটা জ্বালা করে উঠল। মিনতির কথাবার্তায় পূর্বপরিচিতির কোন আভাস নেই।

সোমনাথ উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণে কথা বললে, 'চা-টা কিছু দরকার নেই। আমি চলি। সমীর এলে বলবেন আমার কথা।' তারপর মিনতিকে কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়ে দরজার দিকে এগোল।

পুরশ্চরণ

(পূর্বানুবৃত্তি)

মদন বন্দ্যোপাধ্যায়

নিরুপমা এলো এক হাতে একটা রেকাবীতে দুটি নারকেল নাড়ু আর এক হাতে এক গেলাস জল নিয়ে। নিরুপমাও লক্ষ্য করেছিলো গোপীনাথকে খোকার দিকে চেয়ে বসে থাকতে।

—কি দেখছিলে ওর দিকে চেয়ে? একটু যেন মনটা হাল্কা হয়েছে নিরুপমার।

—কি দেখছিলাম? দেখছিলাম খোকা বেশ বড় হয়ে উঠছে।

—তাতো উঠছেই আর কেমন দিন দিন রং ফুটছে, কত সুন্দর হয়েছে খোকা আগের থেকে।

—তা বটে।—ম্লান হাসলো গোপীনাথ।

—নাও এগুলো খেয়ে জলটা খাও।

—কি, নাড়ু? থাক না ভাল লাগছেনা খেতে, শুধু জল দাও খাই।

—কি হয়েছে বলতো তোমার আজ?

—কিছু না, তবে অফিসে আজ একটা খারাপ ব্যাপার হলো।

—কি হলো আবার?

—বিপিনকাকা চাকরীটা ছেড়ে দিলেন।

—চাকরীটা ছেড়ে দিলেন কেন হঠাৎ?

—হঠাৎ কি আর, অনেক দিনের সহ্যের পর, অন্যায় কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়। আজ সায়েবের সঙ্গে হাতাহাতি।

—সে কি গো! সায়েব যে।

—সায়েব বলে পীর না কি? আমাদেরও অমনি করতে হবে দেখছি। গরুর মত চুপচাপ গালাগাল খেয়ে চাকরী করতে কোন মানুষ পারে না।

—থাক আর বাহাদুরীতে কাজ নেই, যেমন মানুষ তেমনি থাকো, চাকরী করতে হলে ও রকম দু চারটে গালাগাল খেতে হয়।

—মনুষ্যত্ব বিকিয়েও।—গোপীনাথ বললে নিরুপমার দিকে চেয়ে।

—মনুষ্যত্ব? ও সব ছাইপাঁশ মাথায় এনো না বাপু, তোমার ত মাথার ওপর কেউ নেই যে হুট করে একটা কিছু করে ফেলবে।—নিরুপমা বললে সোজা সহজ স্বরে।

গোপীনাথ একটু অবাক হলো। নিরুপমার এ রূপটা কোনদিন দেখেনি। নিজের স্বার্থের বেচাল হাতে দিতে সে রাজি নয়। যেমন চলেছে চলুক, যা আছে থাক। বদলানোর ভয় নিরুপমার

আছে, ওর নিজের কি নেই ? চাকরীটা চলে গেলে কি হবে, কি করবে সে। ও কথা ভেবে দেখেনি গোপীনাথ কোনদিন। নিরুপমা বললে বলেই কথাটা মনে উঠলো। নিছক কেরাণীর মত চাকরী যাওয়ার ভীতি কোনদিনও আসেনি। নিরুপমার কাছে কোনদিনই তো চাকরীর ব্যাপারে কিছু বলেনি। না ভয়, না আশার কথা কিছুই বলেনি গোপীনাথ, আর নিরুপমা নিজে থেকে কোন কথা জিজ্ঞেস করেনি। মাসের শেষে গোপীনাথ টাকা এনে দিয়েছে, নিরুপমা সংসার খরচ করে গেছে—কোন প্রশ্ন ওঠেনি কম বেশীর। সোজা সম্বন্ধ, কোন ঘোর প্যাঁচ নেই, ঝগড়া বা মন কষাকষিও দীর্ঘ ছয় বছরের মধ্যে হয়নি তাদের দুজনের মধ্যে। ছুটি মনই ছিল মুক্ত; ভয়, দ্বিধা, লজ্জা কিছুই ওদের দাম্পত্য জীবনে ফাঁক সৃষ্টি করেনি। তবে খোকা হবার পর থেকেই যেন নিরুপমা একটু বদলে গেছে। অনেক গোছালো, অনেক হিসেবী, আজকাল অনেক ভেবে কাজ করে নিরুপমা।

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে নিয়ে মাতামাতি করতে বোধহয় আর নিরুপমা চায় না। নিজের ঘরের নিরাপত্তার দিকে সব সময়ই সজাগ নিরুপমা। এই সজাগ নিরুপমাকে লক্ষ করেনি গোপীনাথ, তাই আজ চমকালো সে।

—কি ভাবছো ?

—কিছু না তো। হাসার চেষ্টা করে বললে গোপীনাথ।

—নিশ্চয় ভাবছো কিছু, তা নৈলে জলটা হাতেই রয়ে গেছে তোমার—। নিরুপমা বললে।

—কথা বলতে বলতে ভুলে গেছলাম। এই বলে গোপীনাথ জলটা খেয়ে নিয়ে গেলাসটা নিরুপমার হাতে দিলো।

—এখুনি বেরুবে তো ?

—হ্যাঁ। বলে গোপীনাথ উঠে দাঁড়ালো।

নিরুপমা একদৃষ্টে গোপীনাথকে লক্ষ্য করে কি দেখে, মনটাও ভিজে ওঠে ওর—বড্ড ভাল মানুষ, এত ভালমানুষ বলে তাকে সজাগ থাকতে হয়।

—আজ একটু সকাল সকাল ফিরো না। আস্তে করে বলে নিরুপমা।

—কীর্তন শেষ হলেই চলে আসবো। ধীরস্বরে বলে গোপীনাথ কাচা জামাটা গায়ে দিয়ে চটিটা পায়ে দিলো, তারপর নিরুপমার দিকে চেয়ে বললে—তুমি খেয়ে নিও না।

—কি যে বল তুমি, ক্ষিদেয় আমার যেন পেটের ছেলে পড়ে যায় !

—দেরী হয় তো, তাই বলছি। যাক্ বেরোচ্ছি আমি, কিছু দরকার নেই তো ?

—দরকার ? দাঁড়াও এই বলে একটু চুপ করে থেকে নিরুপমা বললে—আচ্ছা আমি কি খুব বুড়ী হয়ে গেছি ?

চুপ করে দেখলো গোপীনাথ নিরুপমাকে তারপর হেসে বললে—না তো, বরং অনেক সুন্দর লাগছে তোমাকে।

—তাই বুঝি এত এড়িয়ে যাও আজকাল। মুখটা ভার করে বললে নিরুপমা।

—এড়িয়ে যাই ! কৈ নিজে তো জানি না ? ওটা বোধহয় তোমার মনের ভুল।

—মনের ভুল, তা বৈকি। আমার এমন ভুলো মন নয় তোমার মত। ঝগড়া করতে চাইছে নিরুপমা গোপীনাথের হঠাৎ-মেঘ-করা মনকে।

—তা হলে—আচ্ছা, ভেবে দেখব'খন কথাটাকে। এখন চলি, বলাই অপেক্ষা করছে। এই বলে গোপীনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে যায় নিরুপমাকে আর কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে।

নিরুপমা চেয়ে থাকলো স্বামীর যাওয়ার দিকে—সত্যিই তার অমন সুন্দর স্বামীও বদলে যাচ্ছে। সে মিষ্টি হাসি-খুশীর স্বভাবটা কেমন যেন মরে যাচ্ছে দিন দিন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিরুপমা আবার খোকার জামা হাতে তুলে নিলো।

সাত

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। প্রায় সাতটায় সন্ধ্যা হয় আজকাল। বেলাটা বড়। মুখুজ্যে বাড়ীর বর্তমান কর্তা দীননাথ বাড়ী ফিরলেন এই সময়। নিজের ঘরে এলেন আস্তে আস্তে, তারপর আলোটা জ্বাললেন। শান্তিও জুতোর শব্দ শুনে ঘরে এল, কাচা কাপড়টা দীননাথের হাতে দিয়ে বললে—কাপড় ছাড় জোঠু, চা করে দিচ্ছি।

দীননাথ শান্তির দিকে চেয়ে মৃদু হেসে আস্তে করে বললেন—ছাড়ছি। কিন্তু তুই যে হঠাৎ ঠাকুর ঘর ছেড়ে, তোর জোঠাইমা কোথায় রে ?

—জোঠাইমা যে কেষ্টনগর চলে গেছে। সেখানে দিদিমার অসুখ। এখানে ঠাকুমারও জ্বর।

—তাই নাকি ? কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বললেন দীননাথ।

—আমি তো কিছুই জানতাম না, ঝি গিয়ে খবর দিতে, এসে দেখি ঠাকুমা জ্বরে বেহুঁস হয়ে রোয়াকে পড়ে গেছেন। বাড়ীতে কেউ নেই, যা ভয় হচ্ছিল। এখন একটু ভাল, জ্বরটা কমেছে।

দীননাথ শান্তির কথাগুলো চুপ করে শুনলেন। কিছু বললেন না।

—যাক্ তুমি মুখ হাত ধোও, আমি চা আনি গে। চন্দ্রা বোধহয় এতক্ষণে করে ফেলেছে।

—শ্যাম আসেনি ?

—না, শ্যামভাই এখনো আসেনি। বিপিনকাকু এসেছে। বোধহয় ঠাকুমার কাছে আছে।

—ও।

দীননাথ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে শান্তি।

দ্বিজবালা কৃষ্ণনগর গেছে, ওর মার অসুখ—কি হলো তাঁর, বোধহয় অসুখটা ভারী রকমের, নাহলে দ্বিজবালাকে খবর দিয়ে ওকে ছোটাতো না—মেয়েকে তো বাপ মা—দুজনেই চেনে—দীননাথ কলতলায় মুখ হাত ধুতে ধুতে ভেবে নিলেন খানিক।

দীনু আছো নাকি ?—শ্যাম ভাংয়ের গলার স্বর শুনলেন দীননাথ।

—কে, শ্যাম নাকি, এস হে।

শ্যামভাই এলেন। উঠোনে দীননাথের সঙ্গে দেখা হতেই মুখে হাসির রেখা টেনে বললেন—এই ফিরলে বুঝি।

—হ্যাঁ ভাই, এই কিছুক্ষণ। চল মাকে একটু দেখে আসি। মুখ মুছতে মুছতে বললেন দীননাথ।

—কাকীমার কি হয়েছে?

—শুনলাম তো জ্বর, এস।—এই বলে কোণের ঘরের দিকে এগুলেন দীননাথ, শ্যামভাইও রোয়াকে উঠে দীননাথকে অনুসরণ করলেন।

—কে, দীনু এলি নাকি? দীননাথ পায়ে হাত দিতেই ভুবনমোহিনী বলে উঠলেন। দিনের সুরুতে আর শেষে প্রৌঢ় দীননাথ মার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে সব কিছু করেন। নিত্য করে আসছেন শৈশব থেকে। দিনের সুরুতে আর শেষে মায়ে ছেলের এই দেখাশোনা নেহাৎ অস্বাভাবিক কারণ না ঘটলে বন্ধ হয় না।

দীননাথ মায়ের পায়ে হাত বুলতে বুলতে বললেন—হ্যাঁ মা। কেমন আছো?

—এখন একটু ভাল বাবা, কাঁপুনিটা কমেছে। বড্ড কম্প দিয়ে জ্বরটা এসেছিল বৌমা চলে যাবার পরই, এদিকে তো আবার বেয়ানের বড্ড অসুখ, বৌমা গেল সেখানে। ওমা শ্যাম যে, দাঁড়িয়ে আছিস কেন, বস্না।

—এই যে বসি কাকীমা। বৌঠান তাহলে কেষ্টনগর চলে গেছেন?

—হ্যাঁ, না গিয়ে কি থাকতে পারে, কিন্তু এদিকে সংসার তো অচল হতে চললো।

—অচল হতে যাবে কেন, আমি তো আছি। শান্তি দু কাপ চা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে বললে।

—তুমি আছো বলেইতো মা সংসারটা ঠিক আছে, তা নৈলে কি করে কি যে হতো।—ভুবনমোহিনী বললেন।

—কি আবার হতো, তুমি গায়ে জ্বর নিয়ে রাঁধতে। নাও জ্যেঠু, চাটা ধর।

—দে। হাত বাড়িয়ে চা নিলেন দীননাথ।

—আমারও? না তুই সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণে।—শ্যামভাইয়ের দিকে আর এককাপ চা শান্তি এগিয়ে ধরতেই শ্যামভাই বললেন।

—অত বলো না, দেমাক যদি হয়।—মুচকি হেসে শ্যামভাইয়ের দিকে চেয়ে বললে শান্তি।

—তা হয় হোক। সে দেমাক হবে তোর গুণের অলঙ্কার। স্বয়ং শ্রীরাধিকাও সময় সময় অলঙ্কার বিভূষিতা হতেন। হাসলেন শ্যামভাই।

—তোমার সঙ্গে তো কথায় পারা যাবে না, ভাবরাজো তোমার সবই ভাল, তার চেয়ে যাই নিজের কাজে। ও হ্যাঁ, ঠাকুমা রাতে তোমার আজ দুধসাবু বুঝলে, সকলকে শুনিয়ে বলে রাখছি, খাবনা বললে হবে না তখন। শান্তি ভুবনমোহিনীর দিকে চেয়ে বললে।

—না বাপু ওসব আর আমি খেতে পারব না। একটু বরং পেসাদ এনে দিস।

সেতো দেব। কিন্তু দুধসাবুও খেতে হবে বুঝলে। জ্যেঠু তোমার মাকে ভালো করে বুঝিয়ে দাও অসুখ করলে দুধসাবুই খেতে হয়।

—হ্যাঁ খাবেখন, তুই যখন ব্যবস্থা করেছিস, মা নিশ্চয় খাবে—দীননাথ হেসে বললেন শান্তির দিকে চেয়ে, তারপর ভুবনমোহিনী দিকে ফিরে বললেন, একটুখানি খাবেখন, কি বল মা?

ভুবনমোহিনী কিছু বললেন না, এ ছেলের কথায় না বলতে পারেন না। অসুস্থ শরীর খেতে ইচ্ছে নেই তবু না বলতে পারলেন না ভুবনমোহিনী।

দীননাথ এবার শান্তির দিকে ফিরে বললেন, তুই যা, মা খাবেখন প্রসাদ খেয়ে।

—সত্যানন্দ কোথায় রে, তাকে দেখছি নাতো? এক চুমুক চা খেয়ে বললেন শ্যামভাই।

—ছিল তো ঠাকুমার কাছেই, বোধহয় ও পড়তে গেছে বিটলের কাছে। এই বলে শান্তি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—ঐ এক ছেলে, বিকেল থেকে আমার কাছে চুপচাপ বসে, বললেও নড়বে না, কত বললুম একটু ঘুরে আয়, তাকি যাবে। একটা কিছু অসুখ বাধিয়ে আমাকে ভোগাবার মতলব আর কি। এই বলে চুপ করলেন ভুবনমোহিনী।

দীননাথ কিছু বললেন না, কি যেন ভাবছেন। হৃয়ত সত্যজিৎকে।

—বড্ড ভাল ছেলে গো তোমার ঐ আপনভোলা ছোট নাতিটি কাকীমা।

—আপনভোলা বলেই তো ভয়, নৈলে আর কি, ওর বয়সে ওর বাপের বিয়ে দিয়েছিলুম, মনে আছে তো তোর।

—তা মনে নেই, খুব আছে—হেসে বললেন শ্যামভাই।

আট

দীননাথের মনে পড়ে যায় সেই বয়েসটার কথা—কত আশা, কত উৎসাহ; অনুসন্ধানের বিরাম নেই, কত বই, পুঁথিতে কি যেন খুঁজেছেন। দ্বন্দ্বের শেষে বিশ্বাস দিয়ে জেনে নিতে বলেছিলেন সেদিন শ্যামভাইয়ের বাবা। ভারী ভালো মানুষ ছিলেন তিনি। এখনও যেন মনের মধ্যে নেই জ্ঞানী বৃদ্ধকে দেখতে পান দীননাথ। অনেক দিনতো হলো তিনি গত হয়েছেন। তবু তাঁর সেই ধীর কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে দীননাথ শুনতে পায়—ভাববার এত কি আছে দীনু, ঘটনা হলো কষ্টিপাথর, তাই এড়িয়ে যেতে নেই, আসছে যখন তখন পরখ করবে বৈকি; তুমি তো পেতল নও যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না; আসল খাঁটি সোনা তুমি, এ পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণই হবে দীনু, মায়ের এই সদ্ হচ্ছেটা সাদরে গ্রহণ করো। তারপর দীননাথ বৃদ্ধ আর ভুবনমোহিনীর কথা মতই আট বছরের বালিকার পাণিগ্রহণ করতে এতটুকু বিরক্তি দেখায়নি, এতটুকু প্রতিবাদও করেনি। ধীর স্থির চিত্তে মন্ত্র উচ্চারণ করে সেদিন ছোট দ্বিজবালাকেই নিজের সহধর্মিণী রূপে গ্রহণ করেছিল। তারপর প্রায় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর কেটে গেল—কত পরিবর্তন, বালিকা রূপ পেলো কিশোরী, তারপর যুবতী; জীবনে ভোগ শীর্ষে পৌঁছে নতুন জীবন দান; ভোগের সঙ্গে সৃষ্টি এই বোধহয় একমাত্র মিলনক্ষেত্র, যার প্রস্তুতি যৌবন করে দিয়ে যায়। এই সৃষ্টিই নিয়ে আসে মানুষের পূর্ণতা। যুগের পর যুগ চলে গেছে, যাচ্ছে, যাবে। মানুষ

বেঁচে থাকবে তার সৃষ্টির মধ্যে সনাতন হয়ে; দীননাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন একটি চিন্তার শেষে।

—কি ভাবছো বসে বসে, চাটাতো ঠাণ্ডা জল হয়ে গেল।

—না, বিশেষ ঠাণ্ডা হয়নি; আমার মত গরম আছে। একচুমুক চা খেয়ে হেসে বললেন দীননাথ।

—ও তুমিতো আবার গরম চা খাও না আমার বাবার মত। মনে আছে তোমার, বাবা ঠাট্টা করে আমাকে বলতেন, তোর অগ্নিমান্দ্য তাই তোকে গরম চা খেতে প্রলুব্ধ করে।

—হ্যাঁ মনে আছে বইকি, আমাদের চা পড়ে থাকতো তুই শেষ করে ফেলতিস। এই বলে দীননাথ নিজের চাটুকু শেষ করে ফেললেন।

ঠিক এই সময় দরজার কাছে বিপিন এসে দাঁড়ালো। শ্যামভাইকে উদ্দেশ্য করে বললে—তুমি এসে গেছো, আমি তো তোমার ওখান থেকে ঘুরে এলুম। আয়, হরিহর। বিপিন জুতোটা খুলে ঘরে এলো। সঙ্গে সঙ্গে হরিহর।

হরিহরকে বয়সের তুলনায় অনেক যেন বুড়ো দেখায়। মাথায় বেশ প্রশস্ত টাকা পড়েছে। আশেপাশে যা চুল আছে তাতে পাক ধরেছে, অথচ বছর পাঁচকের বড় দীননাথের মাথায় খুঁজলে বড়জোর দুএকটা পাকা চুল পাওয়া যাবে। বেঁটে খাটো হৃষ্টপুষ্ট গড়নের চেহারাটি এক কালে বেশ সুন্দর ছিল হরিহরের। গনেশ দাদা বলে ডাকতো বন্ধুরা আদর করে। স্বল্পভাষী হরিহর রাগতো না, বরং হাসতো, আলতো করে জবাব দিতো—চেহারাটা আমার হাতের তৈরী তো নয় যে পালটে ফেলবো। যা খুসি বল্‌না কেন তোরা। সেই হরিহর বুড়িয়ে গেছে। দেহে আর মনে সে জৌলুস নেই। ঘুরে বেড়ানোর নেশাটাও গেছে। এখন বাড়ীর বাইরে যাওয়াটা অফিস আর এই মুখুজ্জে বাড়ীতে সীমাবদ্ধ। খালি রবিবার হলে বিপিনের সঙ্গে বাজার করতে যাওয়াটা আছে। হরিহরকে কিন্তু দীননাথের ভাল লাগে। হয়ত স্বভাবের দিক থেকে দীননাথের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে হরিহরের। মুখবোজা লোক বলে দুবাড়ীর দুটি বৌ অনেক সময় নিজেদের স্বামীদের আখ্যা দিয়েছে। সত্যিই তো এরা কথার থেকে অনুভব করাটাই বেশী পছন্দ করে।

—কেমন আছো এখন বুড়িমা। আস্তে করে ভুবনমোহিনীকে জিজ্ঞেস করলো হরিহর।

—ভাল আছি একটু। এই এলি না কি অফিস থেকে? জামাকাপড় ছাড়িসনি দেখছি।

—না বাড়ী যাইনি এখনও। রাস্তায় বিপিনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, শুনলুম তোমার জ্বর, তাই একেবারে এখানেই এলুম।

—বিপিন, শান্তিকে বলতো ওর বাপকে এককাপ চা করে দিক। উঠে বসতে চেষ্টা করলেন ভুবনমোহিনী। এতজনের মাঝে শুয়ে ঠিক সোয়াস্তি হচ্ছে না বোধহয়।

—উঠছো কেন?

—একটু বসি বাপু, পারিনে আর শুয়ে থাকতে। সেই দুপুর থেকেই শুয়ে আছি। উঠে বসলেন ভুবনমোহিনী।

—তাই বসো তুমি। নাও বালিশটাতে হেলান দিয়ে বসো। দীননাথ বালিশটা ভুবনমোহিনীর পিঠের দিকে করে দিলেন। শান্তিকে ডাক, হরিহরকে চা করে দিক্‌। ভুবনমোহিনীর আবার বললেন ভাল হয়ে বসে।

বিপিন ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে শান্তিকে ডাকলো—শান্তি, এদিকে একবার শুনে যাতো?

—যাই কাকা। রান্নাঘর থেকে সাড়া দিলো শান্তি।

—এদিকে তো আর এক ব্যাপার। হরিহর অফিসের আজকের ঘটনা বলতে চাইছে।

—কি হলো? শ্যামভাই প্রশ্ন করলো।

—থাক না ও সব পরে হবেখন। বিপিন হরিহরকে উদ্দেশ্য করে বললে।

—কি হয়েছে রে হরি, বলতো।—ভুবনমোহিনী জানতে চান।

—ও অফিসর ব্যাপার মা, তুকি শুনে কি করবে। বিপিন মার সামনে আজকের ব্যাপারটা বলতে চায়না।

—কি বলছো কাকু? শান্তি এসে বললে।

—আর দু কাপ চা চাই যে মা, তোর বাবার আর আমার।

—তোমার জন্যে তখন চা করলুম আর তুমি কোথায় চলে গেলে?

—শ্যামদার ওখানে গেছলুম মা। হেসে বললে বিপিন।

—তুমিও দেখছি এখনও বাড়ী যাওনি, অফিসের কোটটা এখনও গায়ে দিয়ে গরমের মধ্যে বেশ বসে রয়েছো? ব্যাপার কি তোমাদের? শান্তি হরিহরের দিকে চেয়ে চোখ পাকালো!

—রাস্তায় বিপিনের কাছে শুনলুম খুড়িমার জ্বর তাই আর বাড়ী যাইনি।

—তা যাওনি বেশ করেছে, কিন্তু কোটটা গা থেকে খুলতে কি হয়েছে।

—এই যে খুলছি মা, খেয়াল ছিল না। হরিহর একটু যেন অপ্রস্তুত হয়েই গা থেকে কোট খুলতে চেষ্টা করলো।

শ্যামভাই হেসে বললেন,—শান্তি মায়ের চোখ এড়াতে পারবে না ভাই হরি।

হরিহর হেসে বললে—তা বটে, চেষ্টা করেও পারি নি শ্যামদা। সেবার জ্বরের সময় সাবু ফেলে দিলুম লুকিয়ে তবু ধরে ফেললে।

এবার শান্তিও হেসে ফেলে বললে—অসুখ করলে তুমি যেমন দুষ্টুমি করো অমন আর কেউ করে না।

শান্তির কথা শুনে দীননাথ হেসে বললেন—মায়ের কাছে ছেলে একটু দুষ্টুমি করে, তা আমাদের শান্তি মায়ের মত মা যদি হয় তো কথাই নেই।

এবার যেন একটু রাঙলো শান্তি, দীননাথের কথা শুনে। দীননাথের প্রশংসা শুনলে

শান্তি কিছু বলতে পারে না মুখের পর, বরং আরো যেন শুনতে ইচ্ছে হয় নরম হয়ে চুপটি করে।

—নিশ্চয়। ও আমাদের মা মশোদা যে। প্রসন্ন হাসি হেসে বললেন শ্যামভাই শান্তির দিকে চেয়ে।

—চাটা করে আনি। আস্তে করে বললে শান্তি, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—হরিহর তুমি সত্যিই ভাগ্যবান ভাই।—শ্যামভাই নয়ন মুদে বললেন। তারপর ওন ওন স্বরের মধ্যে শ্যামভাই ভেসে গেলেন।

—বাইরে কে যেন ডাকছে, দেখতো রে বিপিন। বললেন দীননাথ একটা গলার আওয়াজ পেয়ে।

বিপিন বললে—গুপিনাথরা এলো বোধহয়। এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বিপিন।

—চল শ্যাম, আমরা ওপরে গিয়েই বসি। বললেন দীননাথ।

—হ্যাঁ চল। যাই কাকীমা, কেমন। শ্যামভাই তুবনমোহিনীর দিকে চেয়ে বললেন।

—হ্যাঁ এস, আমি আজ এখান থেকেই শুনবোখন।

—হ্যাঁ আজ আর নড়াচড়া নয়। চল হে দীনু। শ্যামভাই উঠে দাঁড়ালেন।

—চল, এস হে হরিহর। দীননাথ উঠলেন।

নিত্যকার গানের আসর একটু বাদেই জমে উঠবে, কয়েকজন মানুষের সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব কোথায় মিলিয়ে যাবে। কি ঘটলো কি ঘটবে তা নিয়েও ভাবতে বসবে না, শুধু কথা আর সুরের যুক্তবেণীতে অবগাহন করবে মন নানা ভাবে নানা ছন্দে।

খানিক বাদে মিত্তির গিন্নী এলেন এ বাড়ীতে এক গলা ঘোমটা দিয়ে হাতে একটা বড় জাম বাটি নিয়ে—ধোঁকার কালিয়া রেঁধেছেন মিত্তির গিন্নী নিজে। এ বাড়ীর বউঠাকুর ভালবাসেন আর সুখ্যেত করেন মিত্তির গিন্নীর রান্না—ভারী ভাল রাঁধেন কিন্তু বৌমা। আড়াল থেকে শুনলে বড্ড খুশী হন মিত্তির গিন্নী।

রান্নাঘরে গেলেন আগে,—ওমা তুই যে আজ রান্না করছিস্। চন্দ্রাকে দেখে বললেন মিত্তির গিন্নী।

উনুনের গরমে ঘেমে রাঙা হয়ে উঠেছে চন্দ্রাবলী। রুটি সেঁকছে।

—শান্তি কোথায় ?—বাটিটা নামিয়ে রাখলেন।

—ঠাকুর ঘরে গেছে।

ওপরে ঠাকুর ঘর থেকে শ্রীখোলের শব্দ আসছে। বলাইচাঁদ হাতটা ঠিক করে নিচ্ছে।

—হ্যাঁরে তোর কাকা এসেছে ? বাড়ীতে এখনও তো পা দেননি।

—কাকা এসেছে তো, চা করে দিলুম তো এই। ওতে কি, কাকী?

—ধোঁকার ডালনা আছে। তোর বাবাকে খেতে দিয়ে বলিস ওবাড়ীর কাকী রেঁধেছে। হাতে একটু জল দে দেখি, খুড়িমাকে দেখে আসি।

—এই নাও। এই বলে চন্দ্রা ঘটি থেকে জল ঢেলে দিলো মিত্তির গিন্নীর হাতে।

—কি রান্না করলি তোরা ?

—আলুর দম আর রুটি।

—তা আর একটা তরকারীও তো বাড়লো।

—হ্যাঁ।

—খুড়িমা কি নীচের ঘরে আছে ?

—হ্যাঁ, যাও না, বোধহয় আর কেউ নেই, সবাই তো ওপরে গেল।

—হ্যাঁ যাই, দেখা করে চলি, ও বাড়ীতে এখনও অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। এই বলে মিত্তির গিন্নী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ওপরে ঠাকুর ঘরে নামগান এখনও সুরু হয়নি। বিপিনের চাকরী ছাড়ার ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা চলছিলো।

বলাইচাঁদ বেজায় খুশী—বেশ করেছো বিপিনকাকা, সায়েব বলে পীর নাকি।

দীননাথ কিছু বলেনি, ভালো কি মন্দ।

বিপিন অবশ্য শ্যামভাইকে জিজ্ঞেস করলে—কাজটা কি খুব অন্যায় হয়েছে শ্যামদা।

—তোর মন কি বলে ? হেসে জিজ্ঞেস করলেন শ্যামভাই—কোন ক্ষোভ নেই তো ?

—না, যা হয়ে গেছে তার ওপর আর কোন আগ্রহই নেই, ছেড়ে দিলুম ও দায়ত্ব।

—তা বেশ। শ্যামভাই আর কিছু বললেন না।

হরিহরও বললে—বেশ করেছিস, আমাদেরও খানিকটা মনবল বেড়ে গেল। যা হয়ে গেছি কলম পিষে পিষে আর জো হুজুর করে।

গোপীনাথ শুধু একবার বললে—ভাল হতো বিপিনকাকা থাকলে। আত্মবিশ্বাসটা আমাদের বেড়ে যেতো, এ ব্যাপারটা নিয়ে একটা আন্দোলন করলে।

—না বাপু, ও সব আর মন চাইছে না। চাকরী আর করবো না, যা হোক ছোটখাটো একটা ব্যবসা করবো ভাবছি।

—তা তুই পারবি, তোর ধৈর্য্য আছে। হরিহর বললে।

দীননাথ এবার কিছু বলতে চাইলেন। কিন্তু বললেন না।

শ্যামভাই বুঝলো। দীননাথের ভাল লাগছে না এসব বৈষয়িক কথাবার্ত্তা, তাই বললে—মন যা চায় কর বিপিন। এই বলে আস্তে আস্তে করতালটা হাতে তুলে নিয়ে চোখ বুজলেন।

এ ইঙ্গিত সবাই বুঝলো। আর না, এবার মনকে স্থির হতে দাও; হৃদয়ের দ্বার খুলুক সে। তারপর অনেক অনেক ঘুরে, খুঁজে যা পাওনি সেই আনন্দের সন্ধই পাবে তুমি। মনকে স্থির হতে দাও।

চেষ্টা চলেছে, কিন্তু হয় কি স্থির—রাতের স্তব্ধতাও সময় সময় স্তব্ধ হয়ে যায় মানুষের অস্থিরতায়, অধীরতা থেকে মন স্থির হতে চায় না—গভীর ঘুমের মাঝে। স্বপ্নের জালের মধ্যেও মন অধীর হয়ে ওঠে। (ক্রমশঃ)

আলোচনা

দেবতা

মানুষ জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলো সহজাত প্রেরণা (inborn instinct) নিয়ে আসে। তন্মধ্যে club instinct এবং crowd instinctকেই মুখ্য বলে ধরে নিয়ে এবং সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

মানুষের জীবনের এটা স্বাভাবিক ধর্ম—একই সময় দুটো কাজ করতে সে সম্পূর্ণ অক্ষম। একই সময়ে একটার প্রতি বিরক্তি অপরটার প্রতি আসক্তি। একজন ফুটবল খেলতে খেলতে যে মুহূর্ত্তে হাঁপিয়ে ওঠেন তক্ষুনি তিনি কারমবোর্ড খেলতে একটুও দ্বিধা বা অনিচ্ছা প্রকাশ করেন না। বরং তাঁর কাছে খেলাটা প্রীতিপ্রদ সুখকর বলে মনে হয়। ফুটবল খেলার ক্লান্তি তিনি কারমবোর্ড খেলাতে দূর করবার প্রয়াস পান। ক্লান্ত হবার পরেও মানুষের মনে যে প্রেরণা আসে সে ক্লান্তিকে দূর করবার জন্যে তার নাম 'উদ্বৃত্ত শক্তি' (surplus strength)।

সুতরাং club instinct উদ্বৃত্ত শক্তির পরিপূরক তো বটেই এবং সম্পূরক। হাঁপিয়ে ওঠা মন তার নিজস্ব হাঁপানোকে শান্ত করবার মুখ্য উদ্দেশ্যেই আর কয়েকজনের সান্নিধ্য এবং সঙ্গ কামনা করে, সেটা বাড়ীতেই হোক আর বাড়ীর বাইরেই হোক, খেলার মাধ্যমেই হোক কিংবা গল্পের উৎস বেছেই হোক—এই নাম club instinct। club-instinct causes the interchange of minds। আমরা যদি মনের পর্দা তুলে দেখি পরস্পরের প্রতি যে দৈনন্দিন জীবনের ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, ক্ষুদ্র স্বার্থের নাকানিচোবানি আছে এবং পরশ্রীকাতরতা আছে, তা সবই ভুলে যাই যতক্ষণ club instinctএর রসে নিজেদের রসিয়ে ও জমিয়ে রাখি। সে রস শুকিয়ে গেলেই ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ক্রূরতার বেনোজল মনে প্রবেশ করে। সে জল লোণা, তাই মনও লোণা হয়ে উঠে।

এই লোণা জলে থাকতে থাকতে মন যখন অস্বীকার করে এর সঙ্গী তখনই এমন কিছু একটা পরিবেশের অবতারণা ক'রে যা সামাজিক জীবনের একঘেয়েমি ও ক্রূরতার টনক নড়িয়ে দেয়। প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির ধর্ম্মকেন্দ্রিক মনের মধ্যে এরই আভাব পাওয়া যায়। সব মন অনাবিল আনন্দই কামনা করে। আনন্দের পূজারী, আনন্দের ধারক এবং আনন্দের বাহক মন আমাদের মনে নীচতার গণ্ডী টেনে দুভাগ করেনা। বিভিন্ন স্বার্থবাদীরাও কিছুক্ষণের জন্য তাদের স্বার্থকে স্বার্থের বস্তাতে পুরে নিজেদের সবারই সঙ্গে মিলোতে এগিয়ে যায়। কারণ একঘেয়েমির তিক্ততা তাকে কাজে উৎসাহিত করছে না, তাই আনন্দে নিজেকে সিক্ত ক'রে মনের কর্ম্মক্ষমতা বাড়ানো।

আমাদের দেশে যত রকমের পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, এই পূজা-পদ্ধতির মূল আনন্দ লাভ ছাড়া আর কিছু নয়। পূজাতে যে সব দেবতার আরাধনা করি, যে সব দেবতার পূজা করি তার মধ্যে "দেবত্ব" যাই থাকুক না কেন "আনন্দ"ই বর্ত্তমান। আমরা আনন্দেরই পূজা করি। তাই উৎসব বলতে যা কিছু বোঝায় তাও আনন্দ ছাড়া আর অন্য নয়।

উপনিষদে আছে "সচ্চিদানন্দ" পরমপুরুষ। তিনি অক্ষয় অব্যয় এবং অমর। সচ্চিদানন্দই সৃষ্টিকর্ত্তা। সুতরাং তাঁর আরাধনাতে মুক্তি, আর তাঁরই পূজা ও আরাধনা মানুষ বিভিন্ন প্রকারে নানান মূর্ত্তির রূপ দিয়ে করে থাকে।

আমার কাছে 'সচ্চিদানন্দ'র যে ব্যাখ্যা ও রূপ ধরা পড়েছে, তা ব্যাকরণগত সন্ধি বিচ্ছেদ করলেই সহজে সবারই মনে রেখাপাত করবে। সৎ+চিৎ+আনন্দ=সচ্চিদানন্দ। (সৎ—উত্তম+চিৎ—মন)=সচ্চিৎ=উত্তম মন। সুতরাং ব্যাকরণগত অর্থ হচ্ছে—আনন্দই মনকে সৎ (উত্তম) করে। আনন্দের মধ্যেই মানুষ তার নীচতাকে হারিয়ে ফেলে। যতক্ষণ আনন্দ বর্ত্তমান ততক্ষণ উত্তম মনও বর্ত্তমান। যা কিছু সৃষ্টি যা কিছু শিল্প তার মূলেই এই আনন্দ।

এই আনন্দকে যাঁরা বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন সর্ব্বক্ষণ মানুষের মনে, সমাজের মনে, সমাজের কলুষতা সমাজের বিভাগগত-দ্বন্দ্ব যাঁরা চিরতরে মুছে ফেলতে এগিয়ে এসেছিলেন এবং আসছেন তাঁরা অমর, তাঁরা বরণীয়, পূজনীয়, স্মরণীয়, সভ্যতার ক্রম-বিবর্ত্তনের ধাপে ধাপে। সাধারণ মানুষ পারেনি, পারছেনা তাঁদের সঙ্গে চলতে।

উপনিষদ বলছেন—"আনন্দরূপং অমৃতম্", আনন্দের (সুখের, শান্তির) যে রূপ তা কোন দিন মরে না, ক্ষয় হয় না। পৃথিবীতে যা কিছু দেখি যা কিছু তৈরী করি সবের দ্বারা আমরা আনন্দ পাই। চিত্তে আনন্দ থাকলেই চিত্ত সৎ হয়। আনন্দ ব্যতীত চিত্তের ঔদার্য্যতা চিত্তের স্বচ্ছতা বিরাজ করতে পারে না। সুতরাং আনন্দের যাঁরা পূজারী ও স্রষ্টা তাঁরাও অমর। জনৈক কবি বলেছেন :

"তুচ্ছ নয় মনুষ্যত্ব
দেব নয় মানুষ অমর।"

ত্রিলোচন সরকার

গ্রন্থপরিচয়

সঙ্গীত-পরিক্রমা: নারায়ণ চৌধুরী। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড কোম্পাণী লিঃ। তিন টাকা চার আনা

'সঙ্গীত কানে শুনবার ও মন দিয়ে উপলব্ধি করবার, এ নিয়ে সাহিত্য রচনার অবকাশ নেই', 'থিওরী পড়াশুনো করে সঙ্গীতের মর্মোদ্ধার হয়না', 'গানের ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়, প্রয়োজনই বা কোথায়'—এমনতর কথাবার্তা আজকের দিনেও অনেক সঙ্গীতরসিকদের মুখে শোনা যায়। প্রকৃতপক্ষে যাঁরা সত্যকার সঙ্গীতচর্চায় জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের সুরের মোহজাল থেকে নিস্তার পাবার উপায় নেই; অন্যপক্ষে যাঁরা ঐতিহাসিক মাত্র, সঙ্গীতশাস্ত্রের বিরাট ঐতিহ্য যে চর্চা-সাপেক্ষ, সে কথা স্মরণ করেই তারাও শাস্ত্র রচনা বা ইতিহাস বিবৃত করা থেকে নিরস্ত থাকেন। উভয় কারণেই সঙ্গীত বিষয়ে সাহিত্য, প্রয়োজন অনুসারে, অন্ততঃ বাংলাভাষায়, রচিত হয়নি। নারায়ণ চৌধুরী সঙ্গীতরসিক এবং একদা নিষ্ঠা সহযোগেই সঙ্গীতচর্চা করেছিলেন—একথা যাঁরা জানেন তাঁরা তাঁর এই বইখানিকে সাদরে গ্রহণ করবেন। বইটির সূচীপত্র আগাগোড়া দেখলেই একথা প্রমাণিত হবে যে ঠিক এ-জাতীয় একটি বইয়ের সত্যি কত প্রয়োজন ছিল! আধুনিক যুগের নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে কোন বিষয় সঠিকভাবে না জানলেও অথবা চর্চা না করলেও তা নিয়ে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লেখা চলে; সব কিছুই জানা আছে এমন একটি মনোভাব নিয়ে যে কোন দুরূহ বিষয়ের বিচার বিশ্লেষণও সম্ভব, খবরের কাগজের পাতা ওল্টালেই তা এক নিমেষেই নজরে পড়ে। সম্মেলনগুলিতে উপস্থিত থেকে প্রায়ই দেখেছি, যে ব্যক্তি জীবনে একদিনও তানপুরা সহযোগে (অন্ততঃ হারমোনিয়ম) 'সারিগামা' করেননি, অবলীলাক্রমে ললিত-পঞ্চম, গুর্জরী-টোড়ী অথবা আলৈয়া বিলাবল, হিন্দোল ইত্যাদি রাগ নিয়ে আলোচনা করে যাচ্ছেন, মিশ্র রাগ ও অপ্রচলিত রাগ রাগিনী সম্পর্কে থিওরীও খাড়া করছেন। সমস্ত জীবন সাধনা করেও যেখানে কণ্ঠ থেকে দরবারী কানাড়ার আরোহ-অবরোহের কোমল গান্ধারের পর্দা সঠিকভাবে লাগানো অনেক সময় সম্ভব হয়না তখন এ ধরনের মূঢ় আলোচনায় বিভ্রান্ত হতে হয় বৈকি! সুখের বিষয়, নারায়ণ চৌধুরী বিশেষজ্ঞ না হলেও এমন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি যাঁর সাঙ্গীতিক পরিবারে জন্ম, যিনি সঙ্গীতের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছেন ও দীর্ঘদিন রাগসঙ্গীত চর্চা করেছেন। সেই হিসেবে তাঁর বইটি যথাযথ মনোযোগ দাবী করে।

আরও একটি কারণে বইটি উল্লেখযোগ্য। যাঁরা সাধারণভাবে সঙ্গীতে উৎসাহী তাঁরা এই

একটিমাত্র পুস্তকেই সঙ্গীতের নানাদিকের বৃত্তান্ত পাবেন। রাগসঙ্গীত সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা, বড় বড় গুণীদের পরিচিতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ, কয়েকজন বিশিষ্ট সুরকারের জীবনী ও পরিশেষে বাংলা হাল আমলের সঙ্গীত সম্পর্কে লেখকের চিন্তাশীল ও মনোজ্ঞ রচনা। অর্থাৎ হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও বাংলা সঙ্গীতের একটি প্রাথমিক ধারণা এ বইটি থেকে সহজেই করা চলে। সে-কারণে, এই সময়ে, আমি একে সঙ্গীত বিষয়ক একটি অপরিহার্য পুস্তক বলে মনে করি।

তবু, স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, বক্তব্যের সঙ্গে নানাস্থানে মতবিরোধের সম্ভাবনা রয়েছে। একে একে সেইগুলি উপস্থিত করি। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রবন্ধটি রাগসঙ্গীতের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা এবং তাতে লেখকের সুচিন্তিত মত এই যে 'উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চলার বেগ থেমে এসেছে', 'এখন তার ঝরে পড়বার পালা', 'চোরা গলিতে প্রবেশের পথ আছে, তা থেকে নির্গমনের পথ নেই', 'রাগসঙ্গীতের ভবিষ্যৎ অনুজ্জ্বল' ইত্যাদি। এবং নারায়ণবাবু একথাই বোঝাতে চেয়েছেন, যতরকম উন্নতি ও উৎকর্ষ সম্ভব, যত বিচিত্র রকম Permutation-combination এক একটি রাগের কাঠামোতে সৃষ্টি করা যেতে পারে, যত রকম মিশ্র রাগরাগিণী ও নতুন রাগ সৃষ্টি করা সম্ভব হতে পারে সবই ইতিমধ্যে করা হয়ে গিয়েছে—এখন শুধু পুরোনোর 'জাবর কাটা' ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু সঙ্গীতবিষয়ে রসবিচার ঠিক সাহিত্য ও শিল্পের মত thematic প্রশ্নকে কেন্দ্র করে নয়। এক্ষেত্রে সঙ্গীত, সাহিত্য বা শিল্প দুটি ধারা থেকেই স্বাতন্ত্র্য দাবী করে। শিল্পকলা যদিচ সব চাইতে ইউনিভার্সাল, তথাপি সঙ্গীতের মুক্তি ও মাধুর্য দুই-ই abstraction এর চরম একটি উপলব্ধি ও তজ্জাত সূক্ষ্ম অনুভূতির উপর নির্ভরশীল। আরো একটি কথা, সাহিত্য ও শিল্প সমাজমানস-নির্ভর; সঙ্গীত, অন্ততঃ বৈদিক যুগের মার্গ সঙ্গীত হলেও, পরবর্তী যুগের রাগসঙ্গীত তা নয়। এর আনন্দ ও মুক্তি নিত্য নতুন রাস্তায় চলতে পারাতেই নয়, বরং শান্ত সমাহিত ভাবগম্ভীর, অচলপ্রতিষ্ঠ সুরের ধ্যানে। এবং সেজন্যই ফৈয়াজ খাঁ, আব্দুল করিম খাঁ, কেশরী বাঈ, পলুসকর অথবা আমির খাঁ সাহেবের কণ্ঠে একই দরবারী কানাড়া প্রতিবারই বিভিন্নভাবে আমাদের বিমুগ্ধ করে। গঙ্গুবাঈ হাঙ্গলের কণ্ঠে হিন্দোল শুনেছি বহুবার, ডাগরবন্ধুদের কণ্ঠেও ধ্রুপদাঙ্গ চালে একই রাগ শুনেছি, কেশরী বাঈও তাই পরিবেশন করেছেন—কখনই পুনরাবৃত্তি দোষে উঠে আসতে হয়নি। একথা হতে পারে, তানসেন অথবা হদ্দু হস্সু খাঁর মত গায়ক সচরাচর দেখা যায়না, সেকারণে একথা বলা মুস্কিল, যে এর গতি চিরতরে রুদ্ধ। বস্তুতঃ গতির প্রশ্ন রাগসঙ্গীতের উৎকর্ষের-ক্ষেত্রে একেবারেই প্রযোজ্য নয়।

দ্বিতীয়তঃ, সম্প্রতি রাগসঙ্গীতে কেবল 'থোর বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোর' ও 'বিরামহীন পৌনঃপুনিকতা-দোষে দুষ্ট'—এমনতর অভিযোগ লেখক করেছেন। এখানে একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই প্রমাণিত হবে যে নারায়ণবাবুর এ অভিযোগের সম্ভবতঃ কোন ভিত্তি নেই। কিরাণা ঘরাণার বিশিষ্ট শিল্পপ্রতিভায় আজ ভারতবর্ষের রাগসঙ্গীতের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ—এই ঘরের একাধিক শিল্পী সঙ্গীতরসিকদের কাছে সুপরিচিত। আবদুল করিম খাঁ, হীরাবাঈ বরোদকার, সুরেশবাবু মানে,

সরস্বতী রাগে, গঙ্গুবাঈ হাঙ্গল, কেসর্‌বাঈ কেরকার, ভীমসেন যোশী ইত্যাদি গায়ক গায়িকা আমাদের কাছে অত্যন্তই সুপরিচিত। অথচ একথা কে বলবেন যে হীরাবাঈ বরোদকার, গঙ্গুবাঈ হাঙ্গল, কেসরবাঈ কেরকার এবং ভীমসেন যোশী এঁরা একই ঘরাণার প্রতিভূ হয়েও 'খোর বড়ি থাড়া ও থাড়া বড়ি খোর' পরিবেশন করেন? একটি বিশেষ রাগের কথা বলি—শুদ্ধ কল্যাণ। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই রাগটি পছন্দ করি এবং এঁদের সকলের কাছেই এই রাগে পূর্ণাঙ্গ খেয়াল শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। অথচ কোন সময়েই আমার কাছে একঘেয়েমি অথবা পৌনঃপুনিকতা দোষে দুষ্ট এমন মনে হয়নি। সুর লাগাবার কায়দায়, আস্থায়ী অন্তরা গাইবার পদ্ধতিতে, বিস্তারের রীতিতে, তান প্রয়োগে, ছন্দের কাজে, গমক ও মীড়ের ব্যবহারে কোনখানেই এই চারজন শিল্পীর খুব বেশী মিল নেই, অথচ আশ্চর্য্য, এরা একই ঘরাণার প্রতিভূ এবং যাঁর সঙ্গীতের সম্যক বোধ আছে তিনি এদের গান শুনে বুঝবেন, এঁরা পৃথক হয়েও একটি বিশেষ ঢংএর খেয়াল গানের রীতি মেনে চলেন। প্রত্যেকেই তাঁর নিজস্ব শিল্পবোধে ও অনুভূতিপ্রবণতায় স্ব স্ব স্বাধীন পথে অগ্রসর হয়েছেন। এবং এই স্বাধীনতাই রাগসঙ্গীতকে অন্যান্য শিল্পের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে।

তৃতীয়তঃ লেখক বলেছেন 'রাগের মৌলিক রূপ অবিকৃত রেখে রাগের ভিতর দুএকটি বাড়তি স্বরের খোঁচ লাগিয়ে যদি তাকে আরো প্রাণবন্ত করে তোলা যায়, তাতে এমন কি মহাপাতক হয় বুঝিনা'। রাগসঙ্গীতে চার রকম স্বরের উল্লেখ আছে, যথা, বাদী, সমবাদী, অনুবাদী ও বিবাদী। বিবাদী স্বরের যে ব্যবহার রাগসঙ্গীতে চলে আসছে তাই কি স্বাধীনতার যথেষ্ট নজির নয়? অথবা ভৈঁরো রাগে কোমল নিখাদ, আশাবরীতে কোমল রেখাব, ভৈরবীতে প্রায় বারোটি স্বর, ললিত রাগে পঞ্চম (ললিত পঞ্চম)—এমনিতর কত ব্যতিক্রমই তো রয়েছে—তবে অত্যন্ত গুণী নিপুণ শিল্পী ব্যতীত বিবাদী স্বর অথবা যথেচ্ছ স্বরের ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। এবং সেটা খুবই যুক্তিসঙ্গত, কেননা, যে কবির ছন্দের উপর প্রচুর দখল রয়েছে তিনিই গদ্য কবিতা লেখবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন—এমন ধারণা আমরা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নজির টেনেই করতে পারি। প্রত্যেকটি রাগেরই একটি সুনির্দিষ্ট রূপ আছে, আবেদন আছে, একটি চরিত্র রয়েছে—কুশলী গায়ক যেমন খুশী করতে পারেন, সে স্বাধীনতাও দেওয়া হয়েছে, শুধু এটুকু প্রয়োজন যেন ভূপালীতে শুদ্ধকল্যাণের আমেজ না আসে, কেদার হাম্বীর মিলে না যায় অথবা দেশ সুরটে গোলমাল না হয়।

তথাপি, রাগসঙ্গীতের বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও লেখকের প্রতিটি বক্তব্যই তাঁর নিজস্ব চিন্তাশীলতার পরিচয় বহন করে এবং সঙ্গীতরসিককে বহু চিন্তার খোরাক দেবে বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে লেখক বিচক্ষণ চিন্তাশীলতার প্রমাণ দিয়েছেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য ও মর্মকথা বলবার গুরুদায়িত্বও যেমন নিয়েছেন তেমনি 'অতিরিক্ত বন্ধন ও অতিরিক্ত স্বাধীনতা এই দুয়ের অন্তর্বর্তী কোন এক জায়গায় এসে আমাদের রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর নতুন করে পরীক্ষা করে দেখা উচিত' এমন যুক্তিপূর্ণ মত উপস্থিত করবার জন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। একটি কথা সব সময়েই মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত সৃষ্টিতেই তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতাকে কাজে

লাগিয়েছেন এবং নিরন্তর নতুন নতুন সৃষ্টির দিকে নিজের প্রতিভাকে চালনা করেছেন। তাতে তিনি যেমন সার্থক হয়েছেন তেমনি দু এক জায়গায় যথাযথ আবেদন শ্রোতার কাছে পৌঁছোতে সমর্থ হননি। তার জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই—প্রত্যেক পরীক্ষানিরীক্ষাতেই আশার সঙ্গে আশা-ভঙ্গের ঝুঁকি নিতে হয়। তবুও একথা সত্যি, রবীন্দ্রসঙ্গীত বাংলার সমগ্র সঙ্গীত সাধনায় একটি উজ্জ্বলতম অধ্যায়ের সূচনা করে এবং লেখক শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহযোগেই এই যথার্থ সঙ্গীতের রূপরস বিচার করেছেন। তথাকথিত রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক ও সমালোচকদের অন্ধ ভক্তির ঊর্দ্ধে থেকে তিনি যে স্বাধীন নিরপেক্ষ আলোচনা করেছেন, তা সর্বথা গ্রহণযোগ্য না হলেও সহৃদয় পাঠকের বিচার ও মনোযোগ নিশ্চয়ই দাবী করে।

কাজী নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে আলোচনাটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে তিনি যে বিষয়ে আমাদের সচেতন করেছেন সেদিকে আজকে সমগ্র আধুনিক সঙ্গীতশিল্পী ও সুরকারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। তিনি বলেছেন: 'গান রচনা করেছেন একজন, সুর যোজনা করেছেন আরেকজন, এই যে রেওয়াজ আজকাল ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে তা সঙ্গীতের মর্মমূলে আঘাত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।' একথা যে কত সত্য তা যে কোন আধুনিক গান শুনলেই স্বীকার করতে বাধ্য হই। এখনকার কালে যা আধুনিক গান বলে প্রচারিত হচ্ছে তা কেবলমাত্র তারাই শুনতে পারেন যাদের কাব্যবোধ ও সুরবোধ কোনটিই নেই। হিমাংশু দত্ত, অজয় ভট্টাচার্য্য ও শচীন দেববর্মণ—এই তিনজনের একত্র সমাবেশে বাংলার কাব্যসঙ্গীত একদিন যে সম্ভাবনাময় পথে এগুচ্ছিল ইদানীংকালে তা একেবারেই অন্তর্হিত হয়েছে বলে মনে হয়। বাংলার লোকসঙ্গীত আলোচনাটি তথ্যপূর্ণ। এই বিষয়টি এত ব্যাপক অনুশীলনসাপেক্ষ ও দুরূহ যে সামান্য স্থানের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়; তথাপি মূল বক্তব্য যথাযথভাবেই লেখক উপস্থিত করতে সক্ষম হয়েছেন। 'যৌথসঙ্গীত' এবং 'সঙ্গীত ও রুচি' প্রবন্ধ দুটি অত্যন্ত মূল্যবান।

পরিশেষে বক্তব্য এই, লেখক বহুদিন সাহিত্যচর্চা করেছেন, সমালোচক হিসেবে তিনি সুপরিচিত, বাংলা গদ্য রচনায় প্রাঞ্জলতার জন্য তাঁর সবিশেষ সুনাম আজও অক্ষুন্ন আছে, তথাপি তাঁর বক্তব্যের পৌনঃপুনিকতা দোষ ও একটু ঢিলেঢালা রচনারীতি যত্নশীল পাঠককে পীড়া দেবে। বই প্রকাশনার সময় তিনি আরো কিছুটা যত্নবান হতে পারতেন না কি?

অরুণ ভট্টাচার্য

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও ২, ন্যায়রত্ন লেনস্থ টেম্পল প্রেস হইতে মুদ্রিত।